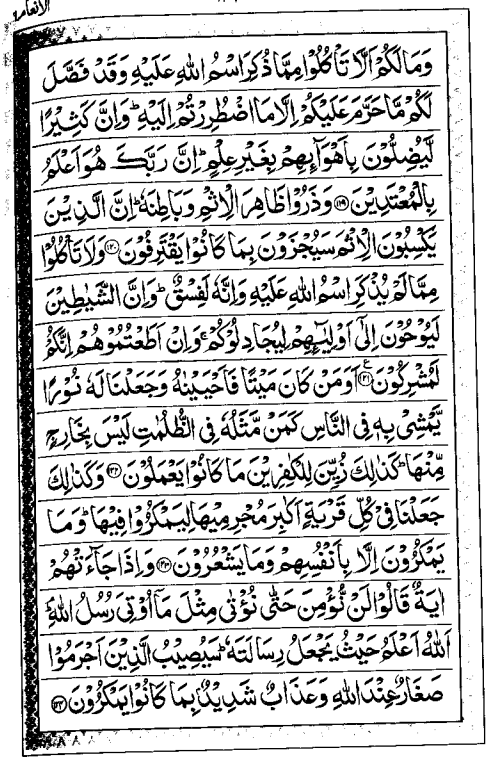

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ
لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا
لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ
يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا تَأْكُلُوا
مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ
لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ
لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾ أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا
يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ
مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾ وَكَذَٰلِكَ
جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ۖ وَمَا
يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ
آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۘ
اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا
صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾

(১১৯) কোন্ কারণে তোমরা এমন জন্তু থেকে ভক্ষণ করবে না, যার উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হয়, অথচ আল্লাহ্ ঐ সব জন্তুর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, যেগুলোকে তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন; কিন্তু সেগুলোও তোমাদের জন্যে হালাল, যখন তোমরা নিরুপায় হয়ে যাও। অনেক লোক স্বীয় ভ্রান্ত, প্রবৃত্তি দ্বারা না জেনে বিপথগামী করতে থাকে। আপনার প্রতিপালক সীমাতিক্রমকারীদেরকে যথার্থই জানেন। (১২০) তোমরা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন গোনাহ্ পরিত্যাগ কর। নিশ্চয় যারা গোনাহ্ করছে, তারা অতিসত্বর তাদের কৃতকর্মের শাস্তি পাবে। (১২১) যেসব জন্তুর উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না ; এ ভক্ষণ করা গোনাহ্। নিশ্চয় শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে প্রত্যাদেশ করে— যেন তারা তোমাদের সাথে তর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তোমরাও মুশরেক হয়ে যাবে। (১২২) আর যে মৃত ছিল অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে এমন একটি আলো দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে। সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যে অন্ধকারে রয়েছে— সেখান থেকে বের হতে পারছে না? এমনিভাবে কাফেরদের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্মকে সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে। (১২৩) আর এমনিভাবে আমি প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের জন্য কিছু সর্দার নিয়োগ করেছি— যেন তারা সেখানে চক্রান্ত করে। তাদের সে চক্রান্ত তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই; কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না। (১২৪) যখন তাদের কাছে কোন আয়াত পৌঁছে, তখন বলে ঃ আমরা কখনই মানব না যে পর্যন্ত না আমরাও তা প্রদত্ত হই, যা আল্লাহ্‌র রসূলগণ প্রদত্ত হয়েছেন। আল্লাহ্ এবিষয়ে সুপরিজ্ঞাত যে, কোথায় স্বীয় পয়গাম প্রেরণ করতে হবে। যারা অপরাধ করছে, তারা অতিসত্বর আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি পাবে, তাদের চক্রান্তের কারণে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে উল্লেখিত হয়েছিল যে, ইসলামের শত্রুরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও কোরআন পাকের খোলাখুলি মো'জেযা দেখা সত্ত্বেও জেদ ও হঠকারিতাবশতঃ নতুন নতুন মো'জেযা দাবী করে। অতঃপর কোরআন ব্যক্ত করেছে যে, যদি তারা বাস্তবিকই সত্যান্বেষী হত, তবে এ যাবত যেসব মো'জেযা প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলো তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্যে পর্যাপ্তের চাইতেও বেশী ছিল। অতঃপর সেসব মো'জেযা বর্ণিত হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং কোরআনে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের কিছু অবস্থা, চিন্তাধারা, উভয়ের সু ও কুপরিণামের বর্ণনা, মুমিন ও কাফের এবং ঈমান ও কুফরের স্বরূপ উদাহরণের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে। মুমিন ও কাফেরের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃত দ্বারা এবং ঈমান ও কুফরের দৃষ্টান্ত আলোক ও অন্ধকার দ্বারা দেয়া হয়েছে। এগুলো কোরআন বর্ণিত দৃষ্টান্ত। এগুলোতে কবিত্ব নেই— আছে সত্যের উদঘাটন।

মুমিন জীবিত, আর কাফের মৃত ঃ এ দৃষ্টান্তে মুমিনকে জীবিত এবং কাফেরকে মৃত বলা হয়েছে। এর কারণ এই যে, মানুষ, জীব-জন্তু, উদ্ভিদ ইত্যাদির মধ্যে জীবনের প্রকার ও রূপরেখা যদিও ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু বিষয়টি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে না যে, এদের মধ্যে প্রত্যেকের জীবনই কোন বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত। প্রকৃতি প্রত্যেকের মধ্যে সে লক্ষ্য অর্জনের যোগ্যতা ও পারদর্শিতা নিহিত রেখেছে। أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ —কোরআনের এ বাক্যে এ বিষয়টিই বর্ণিত হয়েছে যে আল্লাহ্ তাআলা, বিশ্ব জাহানের প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে অভীষ্ট লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছার জন্যে পূর্ণরূপে পথ প্রদর্শন করেছেন। এ পথ প্রদর্শন অনুযায়ী প্রত্যেক সৃষ্টজীব নিজ নিজ কর্তব্য সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হয়ে তা পালন করে যাচ্ছে। কর্তব্য পালনই তাদের প্রত্যেকের জীবনের প্রমাণ। এদের মধ্যে যে বস্তু যখন যে অবস্থায় স্বীয় কর্তব্য পালন ত্যাগ করে, তখন সে জীবিত নয়- মৃত। পানি যদি স্বীয় কর্তব্য পিপাসা নিবারণ ও ময়লা নিষ্কাশন ইত্যাদি ছেড়ে দেয়, তবে তাকে পানি বলা যায় না। আগুন জ্বালানো-পোড়ানো ছেড়ে দিলে আগুন থাকবে না। বৃক্ষ ও ঘাস উৎপন্ন হওয়া, বেড়ে উঠা অতঃপর ফলে-ফুলে সমৃদ্ধ হওয়া ত্যাগ করলে বৃক্ষ ও উদ্ভিদ থাকবে না। কেননা, সে স্বীয় জীবনের লক্ষ্যকে ত্যাগ করেছে। ফলে সে নিষ্প্রাণ মৃতের মত হয়ে গেছে।

সমগ্র সৃষ্ট জগতের বিস্তারিত পর্যালোচনা করার পর সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিও এ ব্যাপারে চিন্তা করতে বাধ্য হবে যে, মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য কি? সে যদি স্বীয় জীবনের লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী হয়, তবে সে জীবিত বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। নতুবা তার স্বরূপ একটি মৃতদেহের চাইতে বেশী কিছু নয়।

এখন দেখতে হবে, মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য কি? উল্লেখিত নীতি অনুযায়ী একথা সুনির্দিষ্ট যে, সে যদি জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য পালন করে যায়, তবে সে জীবত, নতুবা মৃত বলে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য। যেসব জ্ঞানপাপী পন্ডিত মানুষকে জগতের একটি স্বউদগত ঘাস কিংবা একটি চালাক ধরনের জন্তু বলে সাব্যস্ত করেছে, যাদের মতে মানুষ ও গাধার মধ্যে কোন স্বাতন্ত্র্য নেই এবং যারা মানবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা, পানাহার, নিদ্রা-জাগরণ এবং অবশেষে মরে যাওয়াকেই মানব জীবনের

লক্ষ্য হিসাবে স্থির করেছে, তারা প্রকৃত জ্ঞানীদের কাছে সম্বোধনের যোগ্যও নয়। বিশ্বের প্রত্যেক ধর্ম ও চিন্তাধারার সাথে সম্পর্কশীল মনীষীবৃন্দ সৃষ্টির আদিকাল থেকে অদ্যাবধি এ বিষয়ে একমত যে, মানুষ সৃষ্টির সেরা, আশরাফুল মাখলুকাত। এটা জানা কথা যে, যার জীবনের লক্ষ্য সেরা ও উত্তম হওয়ার দিক দিয়ে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী, তাকেই সেরা ও উত্তম বলা যেতে পারে। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি একথাও জানে যে, পানাহার, নিদ্রা-জাগরণ, বসবাস ও পরিধানের ব্যাপারে অন্যান্য জীব-জন্তুর চাইতে মানুষের বিশেষ কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। বরং অনেক জীবজন্তু মানুষের চাইতে উত্তম ও বেশী পানাহার করে, মানুষের চাইতে ভাল প্রাকৃতিক পোশাকে পরিবৃত এবং মানুষের চাইতে উৎকৃষ্ট আলো-বাতাসে বসবাস করে। নিজের লাভ-লোকসান চেনার ব্যাপারেও প্রত্যেক জন্তু বরং প্রত্যেক উদ্ভিদ বেশ সচেতন। উপকারী বস্তু অর্জন এবং ক্ষতিকর বস্তু থেকে আত্মরক্ষার যথেষ্ট যোগ্যতা তারা রাখে। এমনিভাবে অপরের উপকার সাধনের ব্যাপারে তো সকল জীবজন্তু ও উদ্ভিদ বাহ্যতঃ মানুষের চাইতেও অগ্রে। তাদের মাংস, চামড়া, অস্থি, রগ এবং বৃক্ষের শিকড় থেকে নিয়ে শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পল্লব পর্যন্ত প্রতিটি বস্তু সৃষ্টজীবের জন্যে উপকারী। পক্ষান্তরে মানুষের মাংস, চামড়া, লোম, অস্থি, রগ ইত্যাদি কোন কাজেই আসে না।

এখন দেখতে হবে, এমতাবস্থায় মানুষ কিসের ভিত্তিতে 'সৃষ্টির সেরা' পদে অভিষিক্ত হয়েছে? সত্যোপলব্ধির মন্‌যিল এবার কাছেই এসে গেছে। সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, উপরোক্ত বস্তুসমূহের বুদ্ধি ও চেতনার দৌড় উপস্থিত জীবনের সাময়িক লাভ-লোকসান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। এ জীবনেই এগুলো অপরের জন্যে উপকারী বলে দেখা যায়। পার্থিব জীবনের পূর্বে কি ছিল এবং পরে কি হবে— এ ক্ষেত্রে জড়পদার্থ ও উদ্ভিদের তো কথাই নেই, কোন বৃহত্তম হুশিয়ার জন্তুর জ্ঞান-চেতনাও কাজ করে না এবং এক্ষেত্রে এগুলোর মধ্যে কোন বস্তুই কারও উপকারে আসে না। ব্যস, এক্ষেত্রেই সৃষ্টির সেরা মানুষকে কাজ করতে হবে এবং এর দ্বারাই অন্যান্য সৃষ্টজীব থেকে তার স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হতে পারে।

জানা গেল যে, মানুষের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের আদি-অন্তকে সামনে রেখে সবার পরিণাম চিন্তা করে এটা নির্ধারণ করা যে, সামগ্রিক দিক দিয়ে কোন্ বস্তু উপকারী এবং কোন্ বস্তু ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক। অতঃপর এ জ্ঞানের আলোতে নিজের জন্যে উপকারী বস্তুসমূহ অর্জন করা এবং ক্ষতিকর বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে থাকা। অপরকেও এসব উপকারী বস্তুসমূহের প্রতি আহ্বান করা এবং ক্ষতিকর বস্তুসমূহ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট হওয়া, যাতে চিরস্থায়ী সুখ, আরাম ও শান্তির জীবন অর্জিত হয়। যখন মানব জীবনের লক্ষ্য এবং মানবিক পূর্ণতার এ আদর্শগত উপকার নিজেকে অর্জন করতে হবে এবং অপরকে পৌঁছাতে হবে, তখন কোরআনের এ দৃষ্টান্ত বাস্তব রূপ ধারণ করে ফুটে উঠবে যে, ঐ ব্যক্তিই জীবিত যে, আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বিশ্বের আদি-অন্ত ও এর সামগ্রিক লাভ-লোকসানকে খোদায়ী প্রত্যাদেশের আলোকে যাচাই করে। কেননা, নিছক মানবিক জ্ঞান-বুদ্ধি কখনও একাজ করেনি এবং করতে পারেও না। বিশ্বের বড় বড় পন্ডিত ও দার্শনিক অবশেষে একথা স্বীকার করেছেন।

ঈমান আলো এবং কুফর অন্ধকার ঃ ঈমানকে আলো এবং কুফরকে অন্ধকার বলা হয়েছে। চিন্তা করলে বোঝা যায়, এ দৃষ্টান্তটি মোটেই কাল্পনিক নয়— বাস্তব সত্যেরই বর্ণনা। আলো ও অন্ধকারের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করলে দৃষ্টান্তের স্বরূপ ফুটে উঠবে। আলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে নিকট ও দূরের বস্তুসমূহ দেখা, যার ফলে ক্ষতিকর বস্তুসমূহ বেঁচে থাকা এবং উপকারী বস্তুসমূহকে অবলম্বন করার সুযোগ পাওয়া যায়।

এখন ঈমানকে দেখুন। সেটি একটি নূর, যার আলো সমগ্র আকাশ, ভূপৃষ্ঠ এবং এগুলোর বাইরের সব বস্তুতে প্রতিফলিত। একমাত্র এ আলোই গোটা বিশ্বের পরিণাম এবং সবকিছুর বিশুদ্ধ ফলাফল দেখাতে পারে। যার কাছে এ নূর থাকে, সে নিজেও সব ক্ষতিকর বস্তু থেকে বাঁচতে পারে এবং অপরকেও বাঁচাতে পারে। পক্ষান্তরে যার কাছে এ আলো নেই, সে নিজে অন্ধকারে নিমজ্জিত। সামগ্রিক বিশ্ব এবং গোটা জীবনের দিক দিয়ে কোন্ বস্তু উপকারী এবং কোন্ বস্তু অপকারী, সে তা বাছাই করতে পারে না। শুধু হাতের কাছের বস্তুসমূহকে অনুমান করে কিছু চিনতে পারে। ইহকালীন জীবনই হচ্ছে হাতের কাছের পরিবেশ। কাফের ব্যক্তি পার্থিব ও ক্ষণস্থায়ী এ জীবন এবং এর লাভ-লোকসান চিনে নেয়। কিন্তু পরবর্তী চিরস্থায়ী জীবনের কোন খবরই সে রাখে না। এ জীবনের লাভ-লোকসানের কোন অনুভূতিও তার নেই? কোরআন পাক এ বিষয়টি বোঝাবার জন্যেই বলেছেঃ

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ

অর্থাৎ, তারা বাহ্যিক পার্থিব জীবন এবং এর লাভ-লোকসান যৎসামান্য বোঝে, কিন্তু পরকাল সম্পর্কে এরা একেবারেই গাফেল।

অন্য এক আয়াতে পূর্ববর্তী কাফের সম্প্রদায়সমূহের কথা উল্লেখ করার পর কোরআন বলে ঃ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ অর্থাৎ, পরকালের ব্যাপারে এমন তীব্র গাফেল ব্যক্তিরা এ জগতে বোকা ও নির্বোধ ছিল না; বরং তারা ছিল উর্বর মস্তিষ্ক প্রগতিবাদী। কিন্তু এ বাহ্যিক চিন্তার ঔজ্জ্বল্য শুধু জগতের ক্ষণস্থায়ী জীবনের পরিপাটিতেই কাজে লাগতে পারত। পরকালের চিরস্থায়ী জীবনে এর কোন প্রভাব ছিল না।

এ বিবরণ শোনার পর আলোচ্য আয়াতটি পুনরায় পাঠ করুনঃ

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا

উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি পূর্বে মৃত অর্থাৎ, কাফের ছিল, অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি অর্থাৎ, মুসলমান করেছি এবং তাকে এমন একটি নূর অর্থাৎ, ঈমান দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যার অবস্থা এই যে, সে এমন অন্ধকারে নিমজ্জিত, যা থেকে বের হতে পারে না। অর্থাৎ, কুফরের অন্ধকারসমূহে পতিত। সে নিজেই নিজের লাভ-লোকসান চিনে না, অপরকে কি উপকার করবে।

ঈমানের আলোর উপকার অন্যেরাও পায় ঃ এ আয়াতে نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ বলে এ কথাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ঈমানের আলো শুধু মসজিদ, খানকা, নির্জন প্রকোষ্ঠ কিংবা হুজরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ নূর প্রাপ্ত হয়, সে একে নিয়ে জনসমাবেশে চলাফেরা করে এবং সর্বত্র এর দ্বারা নিজেও উপকৃত হয় এবং অপরকেও উপকার পৌঁছায়। আলো কোন অন্ধকারের কাছে পরাভূত হয় না। একটি মিটিমিটি প্রদীপ ও অন্ধকারে নতিস্বীকার করে না, তবে প্রদীপের আলো দূর পর্যন্ত পৌঁছে না। কিরণ প্রখর হলে দূর

পর্যন্ত পৌছে এবং নিস্তেজ হলে অল্প স্থান আলোকিত করে। কিন্তু সর্বাবস্থায়ই সে অন্ধকার ভেদ করে। অন্ধকার তাকে ভেদ করতে পারে না। অন্ধকার যে আলোকে ভেদ করে, সে আলোই নয়। এমনিভাবে যে ঈমান কুফরের কাছে পরাভূত হয়ে যায়, তা ঈমানই নয়। ঈমানের নূর মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায় ও সর্বযুগে মানুষের সাথে থাকে।

এমনিভাবে এ দৃষ্টান্তে আরও একটি ইঙ্গিত রয়েছে যে, আলোর উপকারিতা প্রত্যেক মানুষ ও জীব-জন্তু ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় সর্বাবস্থায় কিছু না কিছু ভোগ করে। মনে করুন, আলোর মালিক চায় না যে, অন্য কেউ এ আলোর দ্বারা উপকৃত হোক এবং অপর ব্যক্তিও উপকার লাভের ইচ্ছা করেনি; কিন্তু কারো সাথে আলো থাকলে অনিচ্ছায় ও স্বাভাবিকভাবে সবাই তদ্দ্বারা উপকৃত হবে। এমনিভাবে মুমিনের ঈমান দ্বারা অন্যরাও কিছু না কিছু উপকার লাভ করে, সে অনুভব করুক বা না করুক। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ, এসব স্পষ্ট ও খোলাখুলি প্রমাণ সত্ত্বেও কাফেরদের কুফরে অটল থাকার কারণ এই যে, প্রত্যেকেই নিজ ধারণায় একটা না একটা বাতিক পোষণ করে। শয়তান ও মানসিক প্রবৃত্তি তাদের মন্দ কাজকেই তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে রেখেছে। এটা মারাত্মক বিভ্রান্তি।– (নাউযুবিল্লাহ মিনহু)

পূর্ববর্তী আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছিল যে, এ জগত একটি পরীক্ষাকেন্দ্র। এখানে সৎকর্মের সাথে যেমন কিছু পরিশ্রম, কষ্ট ও বাধা-বিপত্তি রয়েছে, তেমনি মন্দ কর্মের সাথে ক্ষণস্থায়ী আনন্দ এবং কামনা-বাসনার ধোঁকা সংযুক্ত রয়েছে। এ ধোঁকা অপরিণামদর্শী মানুষের দৃষ্টিতে তাদের মন্দ কাজকেই সুশোভিত করে রাখে। জগতের অনেক চতুর ব্যক্তিও এ ধোঁকায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথমটিতে বর্ণিত হয়েছে যে, এটাও এ পরীক্ষারই এক পিঠ যে, পৃথিবীর আদিকাল থেকে প্রত্যেক জনপদের সর্দার ও ধনী ব্যক্তিরাই বাস্তব সত্য ও পরিণাম ফল থেকে উদাসীন হয়ে ক্ষণস্থায়ী আনন্দে বিভোর হয়ে অপরাধ করে থাকে এবং জনসাধারণ বড় লোকদের পিছনে চলা এবং তাদের অনুকরণ করাকেই সৌভাগ্য ও সাফল্য গণ্য করে। আম্বিয়া (আঃ) ও তাঁদের নায়েব আলেম ও মাশায়েখগণ তাদেরকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে এবং পরিণামের প্রতি আকৃষ্ট করতে চাইলে বড় লোকেরা তাঁদের বিরুদ্ধে নানারকম চক্রান্ত করে। এসব চক্রান্ত বাহ্যতঃ পয়গম্বর, আলেম ও মাশায়েখদের বিরুদ্ধে হলেও পরিণামের দিক দিয়ে এগুলোর শাস্তি স্বয়ং তাদের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে এবং প্রায়শঃ দুনিয়াতেও তা প্রকাশ পায়।

এতে মুসলমানদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যাতে তারা বড় লোক ও ধনীদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে, যেন তাদের পিছনে চলার অভ্যাস না করে, যেন পরিণামদর্শিতা অবলম্বন করে এবং ভাল-মন্দ যেন নিজেই চিনে নেয়।

এছাড়া আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, কোরাইশ সর্দারদের বিরুদ্ধাচরণে আপনি মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না। এটা নতুন ঘটনা নয়। পূর্ববর্তী পয়গম্বরদেরকেও এধরনের লোকের সাথে পালা পড়েছে। পরিণামে এরা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে।

ইমাম বগভী বর্ণনা করেন যে, কোরাইশ প্রধান আবু জাহল একবার বলল যে, আবদে মনাফ গোত্রের (অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর গোত্রের) সাথে আমরা প্রতি ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতা করেছি এবং কখনও পিছনে পড়িনি। কিন্তু এখন তারা বলে ঃ তোমরা ভদ্রতা ও শ্রেষ্ঠত্বে আমাদের সমতুল্য হতে পারবে না। আমাদের পরিবারে একজন নবী আগমন করেছেন। তাঁর কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহী আসে। আবু জাহল বললঃ আল্লাহ্‌র কসম, আমরা কোনদিনই তাদের অনুসরণ করব না, যে পর্যন্ত না আমাদের কাছে তাদের অনুরূপ ওহী আসে। আয়াতের وَاِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ বাক্যের অর্থ তাই।

নবুওয়ত সাধনালব্ধ বিষয় নয়, বরং আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি মহান পদ ঃ কোরআন পাক এ উক্তি বর্ণনা করার পর জওয়াবে বলেছে ঃ

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলাই জানেন, রেসালত কাকে দান করতে হবে। উদ্দেশ্য এই যে, এ নির্বোধ মনে করে রেখেছে যে, নবুওয়ত বংশগত সম্ভ্রান্ততা কিংবা গোত্রীয় সর্দারী ও ধনাঢ্যতার মাধ্যমে অর্জন করা যায়। অথচ নবুওয়ত হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের একটি পদ। এটা অর্জন করা মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত। হাজারো গুণ অর্জন করার পরও কেউ স্বেচ্ছায় অথবা গুণের জোরে রেসালত অর্জন করতে পারে না। এটা খাঁটি আল্লাহ্‌র দান। তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন।

এতে প্রমাণিত হয় যে, রেসালত ও নবুওয়ত উপার্জন করার বস্তু নয় যে, জ্ঞানগত ও কর্মগত গুণাবলী অথবা সাধনা ইত্যাদি দ্বারা অর্জন করা যাবে। আল্লাহ্‌র বন্ধুত্বের সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করেও কেউ নবুওয়ত লাভ করতে পারে না। বরং আল্লাহ্‌র এ খাঁটি অনুগ্রহ আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও রহস্য অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ বন্দাকে দান করা হয়। তবে এটা জরুরী যে, আল্লাহ্ যাকে এ পদমর্যাদা দিতে ইচ্ছা করেন তাকে প্রথম থেকেই এর জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়, তাঁর চরিত্র ও কাজকর্ম বিশেষভাবে গঠন করা হয়।

আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ

এখানে صغار শব্দটি একটি ধাতু। এর অর্থ, অপমান ও লাঞ্ছনা। এ বাক্যের অর্থ এই যে, সত্যের যেসব শত্রু আজ স্বগোত্রে সর্দার ও বড় লোক খেতাবে ভূষিত, অতিসত্বর তাদের বড়ত্ব ও সম্মান ধুলায় লুণ্ঠিত হবে। আল্লাহ্‌র কাছে তারা তীব্র অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করবে এবং কঠোর শাস্তিতে পতিত হবে।

'আল্লাহর কাছে' –এর এক অর্থ এই যে, কেয়ামতের দিন যখন তারা আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হবে, তখন অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় উপস্থিত হবে। অতঃপর তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। দ্বিতীয় অর্থ এটাও হতে পারে যে, বর্তমানে বাহ্যতঃ তারা সর্দার ও সম্মানিত হলেও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদেরকে তীব্র অপমান ও লাঞ্ছনা স্পর্শ করবে। এমনটি দুনিয়াতেও হতে পারে এবং পরকালেও। যেমন, পয়গম্বরদের শত্রুদের ব্যাপারে জগতের ইতিহাসে এরূপ হতে দেখা গেছে। অর্থাৎ, তাঁদের শত্রুরা পরিণামে দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)–এর বড় বড় শত্রু, যারা নিজেরা সম্মানী বলে খুব আস্ফালন করত, তারা একে একে হয় ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে, না হয়

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ
وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا
يَصَّعَّدُ فِي السَّمَآءِ ۚ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ
لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢٥﴾ وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ۚ قَدْ فَصَّلْنَا
الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ﴿١٢٦﴾ لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٧﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ
جَمِيْعًا ۚ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ۚ وَقَالَ
اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّبَلَغْنَآ
اَجَلَنَا الَّذِيْٓ اَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۚ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿١٢٨﴾ وَكَذٰلِكَ
نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٢٩﴾
يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ
يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ
هٰذَا ۚ قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰٓى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ
الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿١٣٠﴾

(১২৫) অতঃপর আল্লাহ্ যাকে পথ-প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন এবং যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বক্ষকে সংকীর্ণ— অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন— যেন সে সবেগে আকাশে আরোহণ করছে। এমনিভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না, আল্লাহ্ তাদের উপর আযাব বর্ষণ করেন। (১২৬) আর এটাই আপনার পালনকর্তার সরল পথ। আমি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্যে আয়াতসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেছি। (১২৭) তাদের জন্যেই তাদের প্রতিপালকের কাছে নিরাপত্তার গৃহ রয়েছে এবং তিনি তাদের বন্ধু তাদের কর্মের কারণে। (১২৮) যেদিন আল্লাহ্ সবাইকে একত্রিত করবেন, হে জিন সম্প্রদায়, তোমরা মানুষদের মধ্যে অনেককে অনুগামী করে নিয়েছ। তাদের মানব বন্ধুরা বলবেঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা পরস্পরে পরস্পরের মাধ্যমে ফল লাভ করেছি। আপনি আমাদের জন্যে যে সময় নির্ধারণ করেছিলেন, আমরা তাতে উপনীত হয়েছি। আল্লাহ্ বলবেনঃ আগুন হল তোমাদের বাসস্থান। তথায় তোমরা চিরকাল অবস্থান করবে; কিন্তু যখন চাইবেন আল্লাহ্। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। (১২৯) এমনিভাবে আমি পাপীদেরকে একে অপরের সাথে যুক্ত করে দেব তাদের কাজকর্মের কারণে। (১৩০) হে জিন ও মানব সম্প্রদায়, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে পয়গম্বরগণ আগমন করেনি, যাঁরা তোমাদেরকে আমার বিধানাবলী বর্ণনা করতেন এবং তোমাদেরকে আজকের এ দিনের সাক্ষাতের ভীতি প্রদর্শন করতেন? তারা বলবেঃ আমরা স্বীয় গোনাহ্ স্বীকার করে নিলাম। পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছে। তারা নিজেদের বিরুদ্ধে স্বীকার করে নিয়েছে যে, তারা কাফের ছিল।

অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় ধ্বংস হয়ে গেছে। আবু জাহ্ল, আবু লাহাব প্রমুখ কোরাইশ সর্দারদের শোচনীয় অবস্থা বিশ্ববাসীর চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। মক্কা বিজয়ের ঘটনা তাদের সবার কোমর ভেঙ্গে দেয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় :

ধর্ম সম্পর্কে বক্ষ উন্মুক্তকরণ এবং এর লক্ষণাদি ঃ বলা হয়েছেঃ

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ

অর্থাৎ, যাকে আল্লাহ্ তাআলা হেদায়েত দিতে চান, তার বক্ষ ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন।

হাকেম মুস্তাদরাক গ্রন্থে এবং বায়হাকী শোআবুল ঈমান গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের বাচনিক বর্ণনা করেন যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে شرح صدر অর্থাৎ, বক্ষ উন্মুক্তকরণের তফসীর জিজ্ঞেস করেন। তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ তাআলা মুমিনের অন্তরে একটি আলো সৃষ্টি করে দেন। ফলে তার অন্তর সত্যকে নিরীক্ষণ করা, হৃদয়ঙ্গম করা এবং গ্রহণ করার জন্যে উন্মুক্ত হয়ে যায়। (সত্যকে সহজে গ্রহণ করতে শুরু করে এবং অসত্যকে ঘৃণা করতে থাকে।) সাহাবায়ে-কেরাম আরয করলেনঃ এরূপ ব্যক্তিকে চেনার মত কোন লক্ষণ আছে কি? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, লক্ষণ এই যে, এরূপ ব্যক্তির সমগ্র আশা-আকাঙ্ক্ষা পরকাল ও পরকালের নেয়ামতের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। সে পার্থিব অন্যায় কামনা-বাসনা এবং ধ্বংসশীল আনন্দ-উল্লাস থেকে বিরত থাকে এবং মৃত্যু আসার পূর্বেই মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হতে থাকে। অতঃপর বলা হয়েছেঃ

وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَآءِ

অর্থাৎ, যাকে আল্লাহ্ তাআলা পথভ্রষ্টতায় রাখতে চান, তার অন্তর সংকীর্ণ এবং অত্যাধিক সংকীর্ণ করে দেন। সত্যকে গ্রহণ করা এবং তদনুযায়ী কাজ করা তার কাছে এমন কঠিন মনে হয়, যেমন কারও আকাশে আরোহণ করা।

তফসীরবিদ কলবী বলেনঃ তার অন্তর সংকীর্ণ হওয়ার অর্থ এই যে, তাতে সত্য ও সৎকর্মের জন্যে কোন পথ থাকে না। হযরত ফারূকে আযম (রাঃ) থেকেও এ বিষয়বস্তু বর্ণিত আছে। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ আল্লাহ্‌র যিকির থেকে তার মন বিমুখ থাকে এবং কুফর ও শেরকের কথাবার্তায় নিবিষ্ট হয়।

সাহাবায়ে কেরাম ধর্মের ব্যাপারে উন্মুক্তবক্ষ ছিলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা সাহাবায়ে কেরামকে স্বীয় রসূলের সংসর্গ এবং প্রত্যক্ষ শিষ্যত্বের জন্যে মনোনীত করেছিলেন। ইসলামী বিধি-বিধানে তাঁরা খুব কমই সন্দেহ ও সংশয়ের সম্মুখীন হতেন। তাঁরা সারা জীবনে যেসব প্রশ্ন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উত্থাপন করেন, সেগুলো গুণাগুণতি কয়েকটি মাত্র। কারণ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সংসর্গের কল্যাণে আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও ভালবাসা তাঁদের অন্তরে সুগভীর রেখাপাত করেছিল। ফলে তাঁরা شرح صدر তথা বক্ষ উন্মুক্তকরণের স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন। তাঁদের অন্তর আপনা থেকেই সত্য ও মিথ্যার মানদন্ডে পরিণত হয়েছিল। তাঁরা সত্যকে অতি সহজে কালবিলম্ব না করে গ্রহণ করে নিতেন এবং অসত্য তাঁদের

অন্তরে পথ খুঁজে পেত না। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর যুগ থেকে যতই দূরত্ব বাড়তে থাকে, সন্দেহ ও সংশয় ততই অন্তরে রাস্তা পেতে থাকে এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মতবিরোধ দেখা দিতে থাকে।

সন্দেহ দূর করার প্রকৃত পন্থা ঃ আজ সমগ্র বিশ্ব এসব সন্দেহ ও সংশয়ের আবর্তে নিপতিত। তারা তর্ক–বিতর্কের মাধ্যমে এর মীমাংসা করতে সচেষ্ট। অথচ এটা এর নির্ভুল পথ নয়।

সাহাবায়ে কেরাম ও পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ যে পথ ধরেছিলেন, সেটাই ছিল যথার্থ পথ। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার পরিপূর্ণ শক্তি ও নেয়ামত কল্পনায় উপস্থিত করে অন্তরে তাঁর মাহাত্ম্য ও ভালবাসা সৃষ্টি করলে সন্দেহ–সংশয় আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়। এ কারণেই কোরআন পাক রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কে এ দোয়া করার আদেশ দিয়েছে ঃ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي অর্থাৎ, হে আমার পালনকর্তা, আমার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দাও।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা এমনিভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদের প্রতি ধিক্কার দেন। তাদের অন্তরে সত্য আসন পায় না এবং তারা প্রত্যেক মন্দ ও অপকর্মে সোল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে— وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا অর্থাৎ, এটা আপনার পালনকর্তার সরল পথ। এখানে هذا (এটা) শব্দ দ্বারা ইবনে মাসউদ (রাঃ)–এর মতে কোরআনের দিকে এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ)–এর মতে ইসলামের দিকে ইশারা করা হয়েছে— (রূহুল মা'আনী)। উদ্দেশ্য এই যে, আপনাকে প্রদত্ত কোরআন কিংবা ইসলাম আপনার পালনকর্তার পথ। অর্থাৎ, এমন পথ, যা আপনার পালনকর্তা স্বীয় প্রজ্ঞার মাধ্যমে স্থির করেছেন এবং মনোনীত করেছেন। এখানে পথকে পালনকর্তার দিকে সম্পৃক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোরআন ও ইসলামের যে কর্মব্যবস্থা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কে দেয়া হয়েছে, তা পালন করা আল্লাহ্ তাআলার উপকারের জন্যে নয়, বরং পালনকারীদের উপকারের জন্যে পালনকর্তার দাবীর ভিত্তিতে দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষকে এমন শিক্ষাই দান করা উদ্দেশ্য যা তাদের চিরস্থায়ী সাফল্য ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধান করে।

এখানে رب শব্দকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর দিকে সম্বন্ধ করে তাঁর প্রতি এমন এক বিশেষ অনুগ্রহ ও কৃপা প্রকাশ করা হয়েছে, যার রসাস্বাদন বিশেষ ব্যক্তিরাই করতে পারেন। কেননা, পালনকর্তা ও উপাস্যের সাথে কোন বন্দার সামান্যতম সম্বন্ধ জড়িত হয়ে যাওয়াও তার জন্যে পরম গৌরবের বিষয়। তদুপরি যদি পরম পালনকর্তা নিজেকে বান্দার দিকে সম্বন্ধ করে বলেন যে, আমি তোমার, তখন তার সৌভাগ্যের সীমা–পরিসীমা থাকে না।

এরপর مُسْتَقِيمًا শব্দ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে যে, কোরআনের এ পথই হলো সরল পথ। এখানেও مُسْتَقِيمًا –কে صِرَاطُ –এর বিশেষণ হিসেবে উল্লেখ না করে অবস্থা হিসেবে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিশ্ব পালকের স্থিরীকৃত পথ মুস্তাকীম ও সরল হওয়া ছাড়া আর কিছু হওয়ার সম্ভাবনাই নাই।–(রূহুল মা'আনী, বাহরে মুহীত)

এরপর قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ —অর্থাৎ, আমি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্যে আয়াতসমূহকে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছি। বলা হয়েছে ঃ এখানে فَصَّلْنَا শব্দটি تفصيل থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে এক এক অধ্যায়কে পৃথক পৃথক করে বিশদভাবে বর্ণনা করা। এভাবে গোটা বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম হয়ে যায়। অতএব, تفصيل –এর সারমর্ম হচ্ছে বিস্তারিত ও বিশদভাবে বর্ণনা করা। উদ্দেশ্য এই যে, আমি মৌলিক বিষয়গুলোকে পরিষ্কার ও বিশদভাবে বর্ণনা করেছি; এতে কোন সংক্ষিপ্ততা বা অস্পষ্টতা রাখিনি। এতে لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কোরআনের বক্তব্য পুরোপুরি সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার হলেও, তদ্দ্বারা একমাত্র তারাই উপকৃত হয়েছে, যারা উপদেশ গ্রহণের অভিপ্রায়ে কোরআনের উপর চিন্তা–ভাবনা করে; জেদ, হঠকারিতা এবং পৈতৃক প্রথার নিশ্চল অনুসরণের প্রাচীর যাদের সামনে অন্তরায় সৃষ্টি করে না।

لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ —অর্থাৎ, উপরোক্ত ব্যক্তি, যারা মুক্ত মনে উপদেশ গ্রহণের অভিপ্রায়ে কোরআনের পয়গাম নিয়ে চিন্তা–ভাবনা করে এবং এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ কোরআনী নির্দেশ মেনে চলে, তাদের জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে 'দারুস্–সালাম'–এর পুরস্কার সংরক্ষিত রয়েছে। এখানে 'দার' শব্দের অর্থ গৃহ এবং 'সালাম' শব্দের অর্থ যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা। কাজেই 'দারুস–সালাম' এমন গৃহকে বলা যায়, যেখানে কষ্ট–শ্রম, দুঃখ, বিষাদ, বিপদাপদ ইত্যাদির সমাগম নেই। নিঃসন্দেহে এটা জান্নাতই হতে পারে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ সালাম আল্লাহ্ তাআলার একটি নাম। দারুস–সালামের অর্থ আল্লাহ্‌র গৃহ। আল্লাহ্‌র গৃহ বলতে শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান বোঝায়। অতএব, সার অর্থ আবারও তাই হয় যে, এমন গৃহ যাতে শান্তি, সুখ, নিরাপত্তা ও প্রশান্তি বিদ্যমান। জান্নাতকে দারুস–সালাম বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একমাত্র জান্নাতই এমন জায়গা, যেখানে মানুষ সর্বপ্রকার কষ্ট, উৎকণ্ঠা, উপদ্রব ও স্বভাব বিরুদ্ধ বস্তু থেকে পূর্ণরূপে ও স্থায়ীভাবে নিরাপদ থাকে। এরূপ নিরাপত্তা জগতে কোন রাজাধিরাজ এবং নবী–রসূলও কখনও লাভ করেন না। কেননা, ধ্বংসশীল জগত এরূপ পরিপূর্ণ ও স্থায়ী শান্তির জায়গাই নয়।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব সৌভাগ্যশালীর জন্যে তাদের প্রতিপালকের কাছে দারুস–সালাম রয়েছে। 'প্রতিপালকের কাছে'–এর এক অর্থ এই যে, এ দারুস–সালাম ইহজগতে নগদ পাওয়া যায় না; কেয়ামতের দিন যখন তারা স্বীয় প্রতিপালকের কাছে যাবে, তখনই তা পাবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, দারুস–সালামের ওয়াদা ভ্রান্ত হতে পারে না। প্রতিপালক নিজেই এর জামিন। তাঁর কাছে তা সংরক্ষিত রয়েছে। এতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ দারুস–সালামের নেয়ামত ও আরাম আজ কেউ কল্পনাও করতে পারে না। যে প্রতিপালকের কাছে এ ভাণ্ডার সংরক্ষিত আছে, তিনিই তা জানেন।

দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে দারুস–সালাম লাভ করা কেয়ামত ও পরকালের উপর নির্ভরশীল মনে হয় না। বরং পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা, এ জগতেও সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা দিয়ে দারুস–সালাম (শান্তির আবাস) দান করতে পারে। দুনিয়ার কোন বিপদাদই তাকে স্পর্শ করে না। যেমন, পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও ওলীগণের মধ্যে এর নজীর দেখতে পাওয়া যায়। আবার পরকালের নেয়ামত তার সামনে উপস্থিত করে তার দৃষ্টিকে এমন সত্যদর্শী করে দেয়া হয় যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী বিপদাপদ তার দৃষ্টিতে নিতান্ত নগণ্য বলে প্রতিভাত হতে থাকে। বিপদের পাহাড়ও তাকে

বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারে না।

এ আয়াতে সৎলোকের জন্যে যে দারুস-সালামের কথা বলা হয়েছে, তা পরকালে তো নিশ্চিত ও অবধারিত; পরন্তু দুনিয়াতেও তাদেরকে দারুস সালামের সুখ ও আনন্দ দেয়া যেতে পারে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থাৎ, তাদের সৎকর্মের কারণে আল্লাহ্ তাআলা তাদের অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী হয়ে যান। তাদের সব মুশকিল আসান হয়ে যায়।

তৃতীয় আয়াতে হাশরের ময়দানে সব জিন ও মানবকে একত্রিত করার পর উভয় দলের সাথে একটি প্রশ্ন ও উত্তর বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা শয়তান জিনদেরকে সম্বোধন করে তাদের অপরাধ ব্যক্ত করবেন এবং বললেনঃ তোমরা মানব জাতিকে পথভ্রষ্ট করার কাজে বিরাট অংশ নিয়েছ। এর উত্তরে জিনরা কি বলবে, কোরআন তা উল্লেখ করেনি। তবে এটা বোঝা যায় যে, মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র সামনে স্বীকারোক্তি করা ছাড়া গতি নেই। কিন্তু তাদের স্বীকারোক্তি উল্লেখ না করার মধ্যেই ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ প্রশ্ন শোনে তারা এমন হতবাক হয়ে যাবে যে, উত্তর দেয়ার জন্যে মুখই খুলতে পারবে না।- (রূহুল-মা'আনী)

এরপর শয়তান মানব অর্থাৎ, দুনিয়াতে যারা শয়তানদের অনুগামী ছিল, নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করেছে, তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্র দরবারে একটি উত্তর বর্ণনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উপরোক্ত প্রশ্ন যদিও তাদেরকে করা হয়নি; কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে তাদেরকেও যেন সম্বোধন করা হয়েছিল। কেননা, তারাও শয়তান জিনদের কাজ অর্থাৎ, পথভ্রষ্টতাই প্রচার করেছিল। এ প্রাসঙ্গিক সম্বোধনের কারণে তারা উত্তর দিয়েছে। কিন্তু বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, মানবরূপী শয়তানদেরকেও প্রশ্ন করা হয়ে থাকবে। তা স্পষ্টতঃ এখানে উল্লেখ করা না হলেও সূরা ইয়াসীনের এক আয়াতে উল্লেখিত হয়েছেঃ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ অর্থাৎ, হে আদম সন্তানরা, আমি কি তোমাদেরকে পয়গম্বরদের মাধ্যমে বলিনি যে, শয়তানদের অনুসরণ করো না?

এতে বোঝা যায়, এ সময়ে মানুষ শয়তানদেরকেও প্রশ্ন করা হবে। তারা উত্তরে স্বীকার করবে যে, নিঃসন্দেহে আমরা শয়তানদের কথা মান্য করার অপরাধ করেছি। তারা আরও বলবেঃ হাঁ, জিন শয়তানরা আমাদের সাথে এবং আমরা তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে পরস্পর পরস্পরের দ্বারা ফল লাভ করেছি। মানুষ শয়তানরা তাদের কাছ থেকে এ ফল লাভ করেছে যে, দুনিয়ার ভোগবিলাস আহরণের উপায়াদি শিক্ষা করেছে এবং কোথাও কোথাও জিন শয়তানদের দোহাই দিয়ে কিংবা অন্য পন্থায় তাদের কাছ থেকে সাহায্যও লাভ করেছে, যেমন মূর্তিপূজারীর মধ্যে বরং ক্ষেত্রবিশেষে অনেক মূর্খ মুসলমানের মধ্যেও এ পন্থা প্রচলিত আছে, যদ্দ্বারা শয়তান ও জিনদের কাছ থেকে কোন কোন কাজে সাহায্য নেয়া যায়। জিন শয়তানরা মানুষদের কাছ থেকে যে ফল লাভ করেছে, তা এই যে, তাদের কথা অনুসরণ করা হয়েছে এবং তারা মানুষকে অনুগামী করতে সক্ষম হয়েছে। এমন কি, তারা মৃত্যু ও পরকালকে ভুলে গিয়েছে। এই মুহূর্তে তারা স্বীকার করবে যে, শয়তানের বিপথগামী করার কারণে আমরা যে মৃত্যু ও পরাকালকে ভুলে গিয়েছিলাম, এখন তা সামনে এসে গেছে। এ স্বীকারোক্তির পর আল্লাহ্ তাআলা বলবেনঃ

النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

অর্থাৎ, তোমরা উভয় দলের অপরাধের শাস্তি এই যে, তোমাদের বাসস্থান হবে অগ্নি, যাতে সদা-সর্বদা থাকবে। তবে আল্লাহ্ কাউকে তা থেকে বের করতে চাইলে তা ভিন্ন কথা। কোরআনের অন্যান্য আয়াতে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ তাআলাও তা চাইবেন না। তাই অনন্তকাল সেখানে থাকতে হবে।

আয়াতে نُوَلِّي শব্দটির আভিধানিক দিক দিয়ে দু'টি অর্থ হতে পারে। (এক) পরস্পরকে যুক্ত করে দেয়া ও নিকটবর্তী করে দেয়া এবং (দুই) শাসক হিসেবে চাপিয়ে দেয়া। তফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কাছ থেকে উভয় প্রকার অর্থই বর্ণিত আছে।

হাশরে কর্ম ও চরিত্রের ভিত্তিতে দল বিভক্ত হবে-- জাগতিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নয়ঃ হযরত সায়ীদ ইবনে জোবায়র, কাতাদা (রঃ) প্রমুখ তফসীরবিদ প্রথমোক্ত অর্থে আয়াতের উদ্দেশ্য এরূপ ব্যক্ত করেছেন যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলার কাছে মানুষের দল বিভিন্ন বংশ, দেশ কিংবা বর্ণ ও ভাষার ভিত্তিতে হবে না; বরং কর্ম ও চরিত্রের ভিত্তিতে হবে। আল্লাহ্র আনুগত্যশীল মুসলমান যেখানেই থাকবে, সে মুসলমানদের সাথী হবে এবং অবাধ্য কাফের যেখানেই থাকবে, সে কাফেরদের সাথী হবে, তাদের বংশ, দেশ, ভাষা, বর্ণ ও জীবনযাপন পদ্ধতিতে যতই দূরত্ব ও পার্থক্যই থেকে থাকুক না কেন।

এরপর মুসলানদের মধ্যেও সৎ ও ধার্মিকেরা ধার্মিকদের সাথে থাকবে এবং পাপী ও কুকর্মীদেরকে কুকর্মীদের সাথে যুক্ত করে দেয়া হবে। সূরা তাকভীরে বলা হয়েছেঃ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ — অর্থাৎ, মানবকুলের যুগল ও দল তৈরী করে দেয়া হবে। এর উদ্দেশ্যও তাই যে, কর্ম ও চরিত্রের দিক দিয়ে হাশরবাসীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে।

হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) এ আয়াতের তফসীরে বলেনঃ সৎ কিংবা অসৎ-এক ধরনের আমলকারীদেরকে একত্রিত করে দেয়া হবে। সৎলোকেরা সৎলোকদের সাথে জান্নাত এবং অসৎলোকেরা অসৎদের সাথে জাহান্নামে পৌঁছবে।

আলোচ্য আয়াতের সার বিষয়বস্তু এই যে, আল্লাহ্ তাআলা কতক জালেমকে অন্য জালেমদের সাথে যুক্ত করে একদলে পরিণত করে দেবেন— বংশগত ও দেশগতভাবে তাদের মধ্যে যতই দূরত্ব থাক না কেন।

অন্য এক আয়াতে একথাও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আজ মানুষের মধ্যে বংশ, দেশ, বর্ণ, ভাষা ইত্যাদির ভিত্তিতে যে পার্থিব ও আনুষ্ঠানিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, হাশরের মাঠে তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বলা হয়েছেঃ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ —অর্থাৎ, যেদিন কেয়ামত কায়েম হবে, সেদিন পরস্পরে ঐক্যবদ্ধ ও ঐকমত্য পোষণকারী ব্যক্তিরা পৃথক হয়ে যাবে।

দুনিয়ার সঙ্ঘবদ্ধ কাজ-কারবারে কর্ম ও চরিত্রের প্রভাবঃ পার্থিব আত্মীয়তা, সম্পর্ক ও আনুষ্ঠানিক সংগঠনসমূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া কেয়ামতের দিন তো সুস্পষ্টভাবে সবারই দৃষ্টিগোচর হবে, দুনিয়াতেও এর সামান্য নমুনা সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। এখানে সৎলোকের সম্পর্ক সৎ লোকদের সাথেই স্থাপিত হয় এবং তাদেরই দল ও সমাজের সাথে জড়িত থাকে। ফলে তার সামনে সৎকর্মের বিভিন্ন পথ খুলতে থাকে এবং তার

দুরবস্থা দৃঢ় হতে থাকে। এমনিভাবে অসৎ ব্যক্তির সম্পর্ক তার মত অসৎ ব্যক্তিদের সাথেই স্থাপিত হয়। সে তাদের মধ্যে উঠাবসা করে। তাদের সংসর্গে তার অসৎকর্ম ও অসচ্চরিত্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তার সামনে সৎকর্মের দ্বার রুদ্ধ হতে থাকে। এটা তার মন্দ–কর্মের নগদ সাজা, যা এ দুনিয়াতেই সে পায়।

রসূলুল্লাহ্ বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা কোন বাদশাহ্ ও শাসনকর্তার প্রতি প্রসন্ন হলে তাকে সৎ মন্ত্রী ও সৎ কর্মচারী দান করেন, ফলে তার রাজ্যের সব কাজকর্ম ঠিকঠাক ও উন্নত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তাআলা কারও প্রতি অপ্রসন্ন হলে সে অসৎ সহকর্মী ও অসৎ কর্মচারী পায়। সে কোন ভাল কাজ করার ইচ্ছা করলেও ফুলিয়ে উঠতে পারে না।

এক জালেম অপর জালেমের হাতে শাস্তি ভোগ করে ঃ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা نُوَلِّيْ শব্দের প্রথমোক্ত অর্থের দিক বর্ণিত হল। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়র, ইবনে যায়েদ (রাঃ), মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদ থেকে দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের তফসীর এরূপ বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তাআলা একজন জালেমকে অপর জালেমের উপর শাসক হিসেবে চাপিয়ে দেন এবং এভাবে একেকে অপরের হাতে শাস্তি দেন।

এ বিষয়বস্তুও যথাস্থানে সঠিক ও নির্ভুল এবং কোরআন–হাদীসের অন্যান্য বক্তব্যের সাথে সঙ্গতিশীল। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ كما تكونون كذلك يؤمر عليكم অর্থাৎ, তোমরা যেমন হবে তোমাদের উপর তেমনি শাসনকর্তা নিযুক্ত হবে। তোমরা জালেম ও পাপাচারী হলে তোমাদের শাসকবর্গ ও জালেম ও পাপাচারীই হবে। পক্ষান্তরে তোমরা সাধু ও সৎকর্মী হলে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের শাসনকর্তারূপে সাধু, দয়ালু ও সুবিচারক লোকদের মনোনীত করবেন।

ইবনে–কাসীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের বাচনিক রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর এ উক্তি বর্ণনা করেছেন ঃ من اعان ظالما سلطه الله عليه অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন অত্যাচারীর অত্যাচারে তাকে সাহায্য করে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে শাস্তি দেয়ার জন্যে এ জালেমকেই তার উপর চাপিয়ে দেন। তার হাতেই তাকে শাস্তি দেন।

দ্বিতীয় আয়াতে একটি প্রশ্ন ও উত্তর বর্ণিত হয়েছে। এ প্রশ্নটি হাশরের ময়দানে জিন ও মানবকে করা হবে। প্রশ্নটি এই ঃ তোমরা কি কারণে কুফর ও আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় লিপ্ত হলে? তোমাদের কাছে কি আমার পয়গম্বর পৌঁছেনি। সে তো তোমাদের মধ্য থেকেই ছিল এবং আমার আয়াতসমূহ তোমাদেরকে পাঠ করে শোনাত, আজকের দিনের উপস্থিতি এবং হিসাব–কিতাবের ভয় প্রদর্শন করত। এর উত্তরে তাদের সবার পক্ষ থেকে পয়গম্বরদের আগমন, আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছানো এবং এতদসত্ত্বেও কুফরে লিপ্ত হওয়ার স্বীকারোক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ভ্রান্ত কর্মের কোন কারণ ও হেতু তাদের পক্ষ থেকে বর্ণনা করা হয়নি ; বরং আল্লাহ্ নিজেই এর কারণ বর্ণনা করেছেন যে, وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا অর্থাৎ, তাদেরকে পার্থিব জীবন ও ভোগ–বিলাস ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে। ফলে তারা একেই মুক্ষ মনে করে বসেছে, অথচ এটা প্রকৃতপক্ষে কিছুই নয়।

আলোচ্য আয়াতে প্রথমতঃ প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, অন্য কতিপয় আয়াতে বলা হয়েছে, হাশরের ময়দানে মুশরিকদেরকে কুফর ও শিরক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তারা মুখ মুছে অস্বীকার করবে এবং পালনকর্তার দরবারে কসম খেয়ে মিথ্যা বলবে ঃ وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ – অর্থাৎ, আমাদের পালনকর্তার কসম, আমরা কখনও মুশরিক ছিলাম না। অথচ এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, তারা অনুতাপ সহকারে স্বীয় কুফর ও শেরক স্বীকার করে নিবে। অতএব, আয়াতদ্বয়ের মধ্যে বাহ্যতঃ পরস্পর বিরোধিতা দেখা দেয়। কিন্তু অন্যান্য আয়াতে এভাবে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, প্রথমে যখন তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে, তখন তারা অস্বীকার করবে। সেমতে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় কুদরত–বলে তাদের মুখ বন্ধ করে দেবেন। হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য নেবেন। আল্লাহ্‌র কুদরতে সেগুলো বাকশক্তি প্রাপ্ত হবে। সেগুলো পরিষ্কারভাবে তাদের কুকর্মের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে দেবে। তখন জিন ও মানব জানতে পারবে যে, তাদের হাত, পা, কান, জিহ্বা সবই ছিল আল্লাহ্‌র গুপ্ত প্রহরী, যারা সব কাজ–কারবার ও অবস্থার অভ্রান্ত রিপোর্ট প্রদান করেছে। এমতাবস্থায় তাদের আর অস্বীকার করার জো থাকবে না। তখন তারা সবাই পরিষ্কার ভাষায় অপরাধ স্বীকার করে নেবে।

জিনদের মধ্যেও কি পয়গম্বর প্রেরিত হন? দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এখানে এই যে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা জিন ও মানব উভয় সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্য থেকে আমার পয়গম্বর কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি? এতে বোঝা যায় যে, মানব জাতির পয়গম্বররূপে যেমন মানব প্রেরিত হয়েছে, তেমনি জিন জাতির পয়গম্বররূপে জিন প্রেরিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে হাদীস ও তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ কেউ বলেন ঃ রসূল ও নবী একমাত্র মানবই হয়েছে। জিন জাতির মধ্যে কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে রসূল হয়নি ; বরং মানব রসূলের বাণী স্বজাতির কাছে পৌঁছানোর জন্যে জিনদের মধ্য থেকে কিছু লোক নিযুক্ত হয়েছে। তারা প্রকৃতপক্ষে মানব–রসূলগণের দূত ও বার্তাবহ ছিল। অপ্রকৃতভাবে তাদেরকেও রসূল বলে দেয়া হয়। যেসব তফসীরবিদ একথা বলেন, তাদের প্রমাণ ঐসব আয়াত, যেগুলোতে জিনদের এ জাতীয় উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, তারা নবীর বাণী অথবা কোরআন শ্রবণ করে স্বজাতির কাছে পৌঁছিয়েছে। উদাহরণতঃ وَلَّوْا إِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ – এবং সূরা জিনের আয়াত فَقَالُوْا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَّهْدِيْٓ إِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ইত্যাদি।

কিন্তু আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে একদল আলেম এ বিষয়েরও প্রবক্তা যে, শেষ নবী (সাঃ)–এর পূর্বে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের রসূল সে সম্প্রদায় থেকেই প্রেরিত হতেন। মানব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন স্তরে মানব রসূল এবং জিন জাতির বিভিন্ন স্তরে জিন রসূলই আগমন করতেন। শেষনবী (সাঃ)–এর বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সমগ্র বিশ্বের মানব ও জিনদের একমাত্র রসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন; তাও কোন এক বিশেষ কালের জন্যে নয়, বরং কেয়ামত অবধি সমস্ত জিন ও মানব তাঁর উম্মত এবং তিনিই সবার রসূল।

হিন্দুদের অবতারও সাধারণতঃ জিন, তাদের মধ্যে কোন রসূল ও নবী হওয়ার সম্ভাবনা ঃ কলবী, মুজাহিদ (রঃ) প্রমুখ তফসীরবিদ এ উক্তিই গ্রহণ করেছেন। কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী তফসীরে–মাযহারীতে এ উক্তি গ্রহণ করে বলেছেন ঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আদম (আঃ)–এর পূর্বে জিনদের রসূল জিনদের মধ্য থেকেই আবির্ভূত হত। যখন একথা প্রমাণিত যে, পৃথিবীতে মানব আগমনের হাজার হাজার বছর

ذٰلِكَ أَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّأَهْلُهَا
غٰفِلُوْنَ ﴿١٣١﴾ وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۚ وَمَا رَبُّكَ
بِغٰفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٢﴾ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۚ
إِنْ يَّشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَآ
أَنْشَأَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ﴿١٣٣﴾ إِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ
لَاٰتٍ ۙ وَّمَآ أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿١٣٤﴾ قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى
مَكَانَتِكُمْ إِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ
عَاقِبَةُ الدَّارِ ۗ إِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿١٣٥﴾ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ
مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا
هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ
لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ
يَصِلُ إِلٰى شُرَكَآئِهِمْ ۗ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿١٣٦﴾ وَكَذٰلِكَ
زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ
شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ۖ
وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣٧﴾

(১৩১) এটা এ জন্যে যে, আপনার প্রতিপালক কোন জনপদের অধিবাসীদেরকে জুলুমের কারণে ধ্বংস করেন না এমতাবস্থায় যে, তথাকার অধিবাসীরা অজ্ঞ থাকে। (১৩২) প্রত্যেকের জন্যে তাদের কর্মের আনুপাতিক মর্যাদা আছে এবং আপনার প্রতিপালক তাদের কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন। (১৩৩) আপনার প্রতিপালক অমুখাপেক্ষী, করুণাময়। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে উচ্ছেদ করে দিবেন এবং তোমাদের পর যাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলে অভিষিক্ত করবেন; যেমন তোমাদেরকে অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশধর থেকে সৃষ্টি করেছেন। (১৩৪) যে বিষয়ের ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হয়, তা অবশ্যই আগমন করবে এবং তোমরা অক্ষম করতে পারবে না। (১৩৫) আপনি বলে দিন ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা স্বস্থানে কাজ করে যাও, আমিও কাজ করি। অচিরেই জানতে পারবে যে, পরিণাম গৃহ কে লাভ করে। নিশ্চয় জালেমরা সুফলপ্রাপ্ত হবে না। (১৩৬) আল্লাহ্ যেসব শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো থেকে তারা এক অংশ আল্লাহ্র জন্য নির্ধারণ করে অতঃপর নিজ ধারণা অনুসারে বলে, এটা আল্লাহ্র এবং এটা আমাদের অংশীদারদের। অতঃপর যে অংশ তাদের অংশীদারদের, তা তো আল্লাহ্র দিকে পৌঁছে না এবং যা আল্লাহ্র তা তাদের উপাস্যদের দিকে পৌঁছে যায়। তাদের বিচার কতই না মন্দ! (১৩৭) এমনিভাবে অনেক মুশরেকের দৃষ্টিতে তাদের উপাস্যরা সন্তান হত্যাকে সুশোভিত করে দিয়েছে যেন তারা তাদেরকে বিনষ্ট করে দেয় এবং তাদের ধর্মমতকে তাদের কাছে বিভ্রান্ত করে দেয়। যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করত না। অতএব, আপনি তাদেরকে এবং তাদের মনগড়া বুলিকে পরিত্যাগ করুন।

পূর্বে জিন জাতি বসবাস করত এবং তারাও মানবজাতির মত বিধি-বিধান পালন করতে আদিষ্ট ছিল, তখন শরীয়ত ও যুক্তির দিক দিয়ে তাদের মধ্যে আল্লাহ্র বিধান পৌঁছানোর জন্যে পয়গম্বর হওয়া অপরিহার্য।

কাযী ছানাউল্লাহ্ (রঃ) আরও বলেন ঃ ভারতবর্ষের হিন্দুরা তাদের ধর্মগ্রন্থ বেদের ইতিহাস হাজার হাজার বছরের পুরানো বলে বর্ণনা করে এবং তাদের অনুসৃত অবতারদেরকে সে যুগেরই লোক বলে উল্লেখ করে। এটা অসম্ভব নয় যে, তারা এ জিন জাতিরই পয়গম্বর ছিলেন এবং তাদেরই আনীত নির্দেশাবলী কালে পুস্তকাকারে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের অবতারদের যেসব চিত্র ও মূর্তি মন্দিরসমূহে রাখা হয়, সেগুলোর দেহাকৃতিও অনেকটা এমনি ধরনের। কারও অনেকগুলো মুখমণ্ডল, কারও অনেক হাত-পা, কারও হাতীর মত শুঁড়। এগুলো সাধারণ মানবাকৃতি থেকে ভিন্ন। জিনদের পক্ষে এহেন আকৃতি ধারণ করা মোটেই অসম্ভব নয়। তাই এটা সম্ভব যে, তাদের অবতার জিন জাতির রসূল কিংবা তাদের প্রতিনিধি ছিলেন এবং তাদের ধর্মগ্রন্থও তাদের নির্দেশাবলীর সমষ্টি ছিল। এরপর আস্তে আস্তে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের ন্যায় একেও পরিবর্তিত করে তাতে শেরক ও মূর্তিপূজা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে।

যদি আসল ধর্মগ্রন্থ এবং জিন জাতির বিশুদ্ধ নির্দেশাবলীও বিদ্যমান থাকত, তবুও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আবির্ভাব ও রেসালতের পর তাও রহিত হয়ে যেত, বিকৃত ও পরিবর্তিত ধর্মগ্রন্থের তো কথাই নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

১৩১ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানব ও জিনদের মধ্য রসূল প্রেরণ করা আল্লাহ্ তাআলার ন্যায়বিচার ও অনুগ্রহের প্রতীক। তিনি কোন জাতির প্রতি এমনিতেই শাস্তি প্রেরণ করেন না, যে পর্যন্ত না তাদেরকে পূর্বাহ্নে পয়গম্বরদের মাধ্যমে জাগ্রত করা হয় এবং হেদায়েতের আলো প্রেরণ করা হয়।

১৩২ নং আয়াতের মর্ম সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ তাআলার কাছে মানব ও জিন জাতির প্রত্যেক স্তরের লোকদের পদমর্যাদা নির্ধারিত রয়েছে। এসব পদমর্যাদা তাদের কাজকর্মের ভিত্তিতেই নির্ধারণ করা হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের প্রতিদান ও শাস্তি এসব কর্মের মাপ অনুযায়ী হবে।

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, জিন ও মানব জাতির প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট রসূল ও হেদায়েত প্রেরণ করা আল্লাহ্ তাআলার চিরন্তন রীতি। পয়গম্বরদের মাধ্যমে তাদেরকে পূর্ণভাবে সতর্ক না করা পর্যন্ত কুফর, শেরক ও অবাধ্যতার কারণে কখনও শাস্তি দেয়া হয়নি।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, পয়গম্বর ও ঐশীগ্রন্থসমূহের অব্যাহত ধারা এ জন্যে ছিল না যে, বিশ্ব পালনকর্তা আমাদের এবাদত ও আনুগত্যের মুখাপেক্ষী কিংবা তাঁর কোন কাজ আমাদের আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল নয়, তিনি সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত। তবে পরিপূর্ণ অমুখাপেক্ষী হওয়ার সাথে সাথে তিনি দয়া গুণেও গুণান্বিত। সমগ্র বিশ্বকে অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব দান করা এবং বিশ্ববাসীর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব প্রয়োজন অযাচিতভাবে মিটানোর কারণও তাঁর এ দয়াগুণ। নতুবা মানুষ তথা গোটা সৃষ্টি নিজের প্রয়োজনাদি নিজে সমাধা করার যোগ্য হওয়া তো দূরের কথা, সে স্বীয় প্রয়োজনাদি চাওয়ার রীতি-নীতিও জানে না। বিশেষতঃ অস্তিত্বের যে নেয়ামত দান করা হয়েছে, তা যে চাওয়া ছাড়াই পাওয়া গেছে, তা দিবালোকের মত স্পষ্ট। কোন মানুষ কোথাও নিজের সৃষ্টির জন্যে দোয়া করেনি এবং অস্তি

জন্মের পূর্বে দোয়া করা কল্পনাও করা যায় না। এমনিভাবে অন্তর এবং দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে মানুষের সৃষ্টি হাত, পা, মন-মস্তিষ্ক প্রভৃতি গুলো কোন মানব চেয়েছিল কি?

আল্লাহ্ কারও মুখাপেক্ষী নন- জগত-সৃষ্টি শুধু তাঁর অনুগ্রহের ফল ঃ মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ শব্দ দ্বারা বিশ্বপালকের অমুখাপেক্ষিতা বর্ণনা করার সাথেই ذُو الرَّحْمَةِ যোগ করে বলা হয়েছে যে, তিনি করুণাময়ও বটে।

আল্লাহ্ যে কোন মানুষকে অমুখাপেক্ষী করেননি তার তাৎপর্য ঃ অমুখাপেক্ষিতা আল্লাহ্ পাকেরই বিশেষ গুণ। নতুবা মানুষ অপরের প্রতি অমুখাপেক্ষী হয়ে গেলে সে অপরের লাভ-লোকসান ও সুখ-দুঃখের প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করত না বরং অপরের প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়ন করতে উদ্যত হত। কোরআন পাকের এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ অর্থাৎ, মানুষ যখন নিজেকে অমুখাপেক্ষী দেখতে পায়, তখন অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যে মেতে উঠে। তাই আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে এমন প্রয়োজনাদির শিকলে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দিয়েছেন, যেগুলো অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে পূর্ণ হতে পারে না। প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা-বাদশাও চাকর-চাকরানীর মুখাপেক্ষী। বিত্তশালী ও মিল মালিক শ্রমিকদের মুখাপেক্ষী। প্রত্যুষে একজন শ্রমিক ও রিক্সাচালক কিছু পয়সা উপার্জন করে অভাব-অনটন দূর করার জন্যে যেমন রোযগারের তালাশে বের হয়, ঠিক তেমনিভাবে বিত্তশালী ব্যক্তিও শ্রমিক, রিক্সা ও যান বাহনের খোঁজে বের হয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সবাইকে অভাব-অনটনের এক শিকলে বেঁধে রেখেছেন। প্রত্যেকেই মুখাপেক্ষী। কারও প্রতি কারও অনুগ্রহ নেই। এরূপ না হলে কোন ধনী ব্যক্তি কাউকে এক পয়সাও দিত না এবং কোন শ্রমিক কারও সামান্য বোঝাও বহন করত না। এটা একমাত্র আল্লাহ্ পাকেরই বিশেষ গুণ যে, পুরোপুরি অমুখাপেক্ষিতা সত্ত্বেও তিনি দয়ালু, করুণাময়।

এরপর আরও বলা হয়েছে যে, তাঁর রহমত যেমন ব্যাপক ও পূর্ণ, তেমনি তাঁর শক্তি-সামর্থ্য প্রত্যেক বস্তু ও প্রত্যেক বিষয়ে পরিব্যাপ্ত। তিনি ইচ্ছা করলে মুহূর্তে সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন। সমগ্র সৃষ্টজগত নিশ্চিহ্ন করে দিলেও তাঁর কুদরতের কারখানায় বিন্দুমাত্র পার্থক্য দেখা দেবে না। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে বর্তমান সৃষ্টজগতকে ধ্বংস করে তদস্থলে অন্য সৃষ্টজগত এমনিভাবে এ মুহূর্তে উদ্ভব করে স্থাপন করতে পারেন। এর একটি নজীর প্রতি যুগের মানুষের সামনেই রয়েছে। আজ কোটি কোটি মানুষ পৃথিবীর আনাচে-কানাচে বসবাস করছে এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজ-কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। যদি আজ থেকে একশ' বছর পূর্বেকার অবস্থার দিকে তাকানো যায়, তবে দেখা যাবে, তখনও এ পৃথিবী এমনিভাবে জমজমাট ছিল এবং সব কাজ-কারবার এভাবেই চলত। কিন্তু তখন বর্তমান অধিবাসী ও কার্য পরিচালনাকারীদের কেউই ছিল না। অন্য এক জাতি ছিল, যারা আজ ভূগর্ভে চলে গেছে এবং যাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত পাওয়া যায় না। বর্তমান দুনিয়া সে জাতির বংশধর থেকেই সৃজিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

"আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে, তোমাদের সবাইকে নিয়ে যেতে পারেন। 'নিয়ে যাওয়ার' অর্থ এমনভাবে ধ্বংস করে দেয়া যেন নাম-নিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট না থাকে। তাই এখানে ধ্বংস করা বা মেরে ফেলার কথা বলা হয়নি ; বরং নিয়ে যাওয়া বলা হয়েছে। এতে পুরোপুরি ধ্বংস ও নাম-নিশানাহীন করে দেয়ার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।"

এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার অমুখাপেক্ষী হওয়া, করুণাময় হওয়া এবং সর্বশক্তির অধিকারী হওয়ার কথা উল্লেখ করার পর অবাধ্য ও নির্দেশ অমান্যকারীদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে,

إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ ۙ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে যে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন, তা অবশ্যই আগমন করবে এবং তোমরা সব একত্রিত হয়েও আল্লাহ্র সে আযাব প্রতিরোধ করতে পারবে না।

তৃতীয় আয়াতে পুনরায় তাদেরকে হুশিয়ার করার জন্যে অন্য এক পন্থা অবলম্বন করে বলা হয়েছে ঃ

"হে রসূল, আপনি মক্কাবাসীদেরকে বলে দিন ঃ হে আমার সম্প্রদায়, যদি তোমরা আমার কথা না মান, তবে না মানা তোমাদের ইচ্ছা এবং স্বস্থানে স্বীয় বিশ্বাস ও হঠকারিতা অনুযায়ী কাজ করতে থাক। আমিও স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে থাকব। এতে আমার কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু অচিরেই তোমরা জানতে পারবে যে, কে পরকালের মুক্তি ও সফলতা অর্জন করে। মনে রেখো, জালেম অর্থাৎ, অধিকার আত্মসাৎকারী কখনও সফল হয় না।"

পরবর্তী আয়াতে মুশরিকদের একটি বিশেষ পথভ্রষ্টতা ব্যক্ত করা হয়েছে। আরবদের অভ্যাস ছিল যে, শস্যক্ষেত্র, বাগান এবং ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে যাকিছু আমদানী হত, তার এক অংশ আল্লাহ্র জন্যে এবং এক অংশ উপাস্য দেব-দেবীর নামে পৃথক করে রাখত। আল্লাহ্র নামের অংশ থেকে গরীব-মিসকীনকে দান করা হত এবং দেব-দেবীর অংশ মন্দিরের পূজারী, সেবায়েত ও রক্ষকদের জন্যে ব্যয় করত।

প্রথমতঃ এটাই কম অবিচার ছিল না যে, যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ এবং সমুদয় উৎপন্ন ফসলও তিনিই দান করেছেন, কিন্তু আল্লাহ্ প্রদত্ত বস্তুসমূহের মধ্যে প্রতিমাদেরকে অংশীদার করা হত। তদুপরি তারা আরও অবিচার করত এই যে, কখনও উৎপাদন কম হলে তারা কমের ভাগটি আল্লাহ্র অংশ থেকে কেটে নিত, অথচ মুখে বলত ঃ আল্লাহ্ তো সম্পদশালী, অভাবমুক্ত, তিনি আমাদের সম্পদের মুখাপেক্ষী নন। এরপর প্রতিমাদের অংশ এবং নিজেদের ব্যবহারের অংশ পুরোপুরি নিয়ে নিত। আবার কোন সময় এমনও হত যে, প্রতিমাদের কিংবা নিজেদের অংশ থেকে কোন বস্তু আল্লাহ্র অংশে পড়ে গেলে তা হিসাব ঠিক করার জন্যে সেখান থেকে তুলে নিত। পক্ষান্তরে যদি আল্লাহ্র অংশ থেকে কোন বস্তু নিজেদের কিংবা প্রতিমাদের অংশে পড়ে যেত, তবে তা সেখানেই থাকতে দিত এবং বলত ঃ আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, তাঁর অংশ কম হলেও ক্ষতি নেই। কোরআন পাক তাদের এ পথভ্রষ্টতার উল্লেখ করে বলেছেঃ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ অর্থাৎ, তাদের এ বিচারপদ্ধতি অত্যন্ত বিশ্রী ও একদেশদর্শী। যে আল্লাহ্ তাদেরকে এবং তাদের সমুদয় বস্তু-সামগ্রীকে সৃষ্টি করেছেন, প্রথমতঃ তারা তাঁর সাথে অপরকে অংশীদার করেছে। তদুপরি তাঁর অংশও নানা ছলছুতায় অন্যদিকে পাচার করে দিয়েছে।

কাফেরদের প্রতি হুশিয়ারীতে মুসলমানদের জন্যে শিক্ষাঃ এ হচ্ছে মুশরিকদের একটি পথভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তির জন্যে হুশিয়ারী। এতে ঐসব মুসলমানের জন্যেও শিক্ষার চাবুক রয়েছে, যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পূর্ণ কার্যক্ষমতাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে বয়স ও

وَقَالُوْا هٰذِهٖٓ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَآ اِلَّا مَنْ
نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَاَنْعَامٌ
لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيْهِمْ
بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣٨﴾ وَقَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ
خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰٓى اَزْوَاجِنَا وَاِنْ يَّكُنْ
مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَآءُ سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ
عَلِيْمٌ ﴿١٣٩﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْٓا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا
بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ
قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿١٤٠﴾ وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ
جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ
حَصَادِهٖ وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿١٤١﴾ وَ
مِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَ
لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٤٢﴾

(১৩৮) তারা বলে ঃ এসব চতুষ্পদ জন্তু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ। আমরা যাকে ইচ্ছা করি, সে ছাড়া এগুলো কেউ খেতে পারবে না, তাদের ধারণা অনুসারে। আর কিছুসংখ্যক চতুষ্পদ জন্তুর পিঠে আরোহণ হারাম করা হয়েছে এবং কিছুসংখ্যক চতুষ্পদ জন্তুর উপর তারা ভ্রান্ত ধারণাবশতঃ আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে না, তাদের মনগড়া বুলির কারণে; অচিরেই তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন। (১৩৯) তারা বলে ঃ এসব চতুষ্পদ জন্তুর পেটে যা আছে, তা বিশেষভাবে আমাদের পুরুষদের জন্যে এবং আমাদের মহিলাদের জন্যে তা হারাম। যদি তা মৃত হয়, তবে তার প্রাপক হিসাবে সবাই সমান। অচিরেই তিনি তাদেরকে তাদের বর্ণনার শাস্তি দিবেন। তিনি প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। (১৪০) নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা নিজ সন্তানদেরকে নির্বুদ্ধিতাবশতঃ কোন প্রমাণ ছাড়াই হত্যা করেছে এবং আল্লাহ্ তাদেরকে যেসব দিয়েছিলেন, সেগুলোকে আল্লাহ্‌র প্রতি ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে হারাম করে নিয়েছে। নিশ্চিতই তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং সুপথগামী হয়নি। (১৪১) তিনিই উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছে—তাও, যা মাচার উপর তুলে দেয়া হয় এবং যা মাচার উপর তোলা হয় না, এবং খর্জুর বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র—যেসবের স্বাদবিশিষ্ট এবং যয়তুন ও আনার সৃষ্টি করেছেন—একে অন্যের সাদৃশ্যশীল এবং সাদৃশ্যহীন। এগুলোর ফল খাও, যখন ফলন্ত হয় এবং হক দান কর কর্তনের সময়ে এবং অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না। (১৪২) তিনি সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে বোঝা বহনকারীকে এবং খর্বাকৃতিকে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন, তা থেকে খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

সময়ের এক অংশ তারা আল্লাহ্‌র এবাদতের জন্যে নির্দিষ্ট করে; অথচ জীবনের সমস্ত সময় ও মুহূর্তকে তাঁরই এবাদত ও আনুগত্যের জন্য ওয়াক্‌ফ করে মানবিক প্রয়োজনাদি মিটানোর জন্যে তা থেকে কিছু সময় নিজের জন্যে বের করে নেয়াই সঙ্গত ছিল। সত্য বলতে কি, এরপরও আল্লাহ্‌র যথার্থ কৃতজ্ঞতা আদায় হত না। কিন্তু আমাদের অবস্থা এই যে, দিবা-রাত্রির চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যদি কিছু সময় আমরা আল্লাহ্‌র এবাদতের জন্যে নির্দিষ্ট করি, তবে কোন প্রয়োজন দেখা দিলে কাজ-কারবার ও আরাম-আয়েশের সময় পুরোপুরি ঠিক রেখে তার সমস্ত জের নামায, তেলাওয়াত ও এবাদতের জন্যে নির্দিষ্ট সময়ের উপর ফেলে দেই। কোন অতিরিক্ত কাজের সম্মুখীন হলে কিংবা অসুখ-বিসুখ হলে সর্বপ্রথম এর প্রভাব এবাদতের নির্দিষ্ট সময়ের উপর পড়ে। এটা নিঃসন্দেহে অবিচার, অকৃতজ্ঞতা এবং অধিকা রহরণ। আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং সব মুসলমানকে এহেন গর্হিত কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুশরিকদের এ পথভ্রষ্টতা বর্ণিত হয়েছিল যে, জালেমরা আল্লাহ্ সৃজিত জন্তু-জানোয়ার এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামতসমূহে স্বহস্তনির্মিত নিষ্প্রাণ অচেতন প্রতিমাদেরকে আল্লাহ্‌র অংশীদার স্থির করেছিল এবং যেসব বস্তু তারা সদকা-খয়রাতের জন্যে পৃথক করত, যেগুলোতে এক অংশ আল্লাহ্‌র এবং এক অংশ প্রতিমাদের জন্যে রাখত। অতঃপর আল্লাহ্‌র অংশকেও বিভিন্ন ছলছুতায় প্রতিমাদের অংশের মধ্যে পাচার করে দিত। এমনি ধরনের আরও অনেক মূর্খতাসুলভ কুপ্রথাকে তারা ধর্মীয় আইনের মর্যাদা দান করেছিল।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা উদ্ভিদ ও বৃক্ষের বিভিন্ন প্রকার এবং তাদের উপকারিতা ও ফল সৃজনে স্বীয় শক্তি-সামর্থ্যের বিস্ময়কর পরাকাষ্ঠা বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় আয়াতে এমনিভাবে জানোয়ার ও চতুষ্পদ জন্তুদের বিভিন্ন প্রকার সৃজনের কথা উল্লেখ করে মুশরিকদের পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে হুশিয়ার করেছেন যে, এ কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকেরা কেমন সর্বশক্তিমান, মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র সাথে কেমন অজ্ঞ, অচেতন, নিষ্প্রাণ ও অসহায় বস্তুসমূহকে শরীক ও অংশীদার করে ফেলেছে।

অতঃপর তাদেরকে সরল পথ ও বিশুদ্ধ কর্মপন্থা নির্দেশ করেছেন যে, যখন এসব বস্তু সৃষ্টি করা ও তোমাদেরকে দান করার কাজে কেউ অংশীদার নেই, তখন এবাদতে তাদেরকে অংশীদার করা একান্তই অকৃতজ্ঞতা ও জুলুম। যিনি এসব বস্তু সৃষ্টি করে তোমাদেরকে দান করেছেন এবং এমন অনুগত করে দিয়েছেন যে, তোমরা যেভাবে ইচ্ছা সেগুলোকে ব্যবহার করতে পার, এরপর সবগুলোকে তোমাদের জন্যে হালাল করে দিয়েছেন, তোমাদের কর্তব্য এসব নেয়ামত দ্বারা উপকৃত হওয়ার সময় তাঁর কৃতজ্ঞতা স্মরণে রাখা এবং প্রকাশ করা—শয়তানী ধ্যান-ধারণা এবং মূর্খতাসুলভ প্রথাকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়।

প্রথম আয়াতে اَنْشَاَ শব্দের অর্থ সৃষ্টি করেছেন এবং مَّعْرُوْشٰتٍ শব্দটি عرش থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ উঠানো এবং উচ্চ করা। مَّعْرُوْشٰتٍ উদ্ভিদের ঐসব লতা বোঝানো হয়েছে, যেগুলোকে মাচার উপর চড়ানো হয়। যেমন, আঙ্গুর ও কোন কোন শাকসব্জি। এর বিপরীতে غَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ বলে ঐ সমস্ত বৃক্ষ বোঝানো হয়েছে, যেগুলোর লতা উপরে চড়ানো হয় না; কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষ হোক, যাদের লতাই হয় না, কিংবা লতাবিশিষ্ট হোক,

কিন্তু সেগুলো মাটিতেই বিস্তৃত হয় এবং উপরে চড়ানো হয় না; যেমন তরমুজ, খরবুযা ইত্যাদি।

نخل শব্দের অর্থ খর্জুর বৃক্ষ, زرع সর্বপ্রকার শস্য, زيتون যয়তুন বৃক্ষকে বলা হয় এবং এর ফলকেও এবং رمان ডালিমকে বলা হয়।

এসব আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা প্রথমে বাগানে উৎপন্ন বৃক্ষসমূহের দুই প্রকার বর্ণনা করেছেন। এক, যেসব বৃক্ষের লতা উপরে চড়ানো নয় এবং দুই, যেসব বৃক্ষের লতা উপরে চড়ানো হয় না। এতে আল্লাহ্র চূড়ান্ত রহস্য ও কুদরতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, একই মাটি, একই পানি এবং একই পরিবেশে কেমন বিভিন্ন প্রকার চারাগাছ সৃষ্টি করেছেন। এরপর এদের ফল তৈরী, সজীবতা এবং এদের মধ্যে নিহিত হাজারো বৈশিষ্ট্য ও প্রভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে কোন বৃক্ষের প্রকৃতি এমন করেছেন যে, যতদিন লতা উপরে না চড়ানো হয়, ততদিন প্রথমতঃ ফলই ধরে না–যদি ধরেও, তবে তা বাড়ে না এবং বাকী থাকে না; যেমন আঙ্গুর ইত্যাদি। পক্ষান্তরে কোন বৃক্ষের প্রকৃতি এমন করেছেন যে, লতা উপরে চড়াতে চাইলেও চড়ে না–চড়ালেও ফল দুর্বল হয়ে যায়; যেমন খরবুযা, তরমুজ ইত্যাদি। কোন কোন বৃক্ষকে মজবুত কাণ্ডের উপর দাঁড় করিয়ে এত উচ্চে নিয়ে গেছেন যে, মানুষের চেষ্টায় এত উচ্চে নিয়ে যাওয়া স্বভাবতঃ সম্ভবপর ছিল না। বিরাট রহস্যের অধীনে ফলের প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে বৃক্ষসমূহ বিভিন্নরূপ সৃষ্টি করা হয়েছে। কোন কোন ফলে মাটিতেই বাড়ে এবং পরিপক্ব হয় এবং কোন কোন ফল মাটির সংস্পর্শে নষ্ট হয়ে যায়। কতক ফলের জন্যে উচ্চ শাখায় ঝুলে অবিরাম তাজা বাতাস, সূর্যকিরণ এবং তারকার রশ্মি থেকে রং গ্রহণ করা জরুরী। সর্বশক্তিমান প্রত্যেকের জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ

এরপর বিশেষভাবে খর্জুর বৃক্ষ এবং শস্যের কথা উল্লেখ করেছেন। খর্জুর ফল সাধারণভাবে চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে খাওয়া হয়। প্রয়োজন হলে এ দ্বারা পূর্ণ খাদ্যের কাজও নেয়া যায়। শস্যক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্য থেকে সাধারণতঃ মানুষের খোরাক এবং জন্তু-জানোয়ারের খাদ্য সংগ্রহ করা হয়। এ দু'টি বস্তু উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ এখানে اكله -এর সর্বনাম زرع এবং نخل উভয়ের দিকে যেতে পারে। অর্থ এই যে, খেজুরের বিভিন্ন প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের বিভিন্ন স্বাদ আছে। শস্যের তো শত শত প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের বিভিন্ন স্বাদ ও উপকারিতা আছেই। একই পানি, বাতাস এবং একই মাটি থেকে উৎপন্ন ফলের মধ্যে এত বিরাট ব্যবধান এবং প্রত্যেক প্রকারের উপকারিতা ও বৈশিষ্ট্যের এমন বিস্ময়কর বিভিন্নতা স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকেও একথা স্বীকার করতে বাধ্য করে যে, এদের সৃষ্টিকর্তা এমন এক অচিন্তনীয় সত্তা, যার জ্ঞান ও রহস্য মানুষ অনুমান করতেও সক্ষম নয়।

এরপর আরও দু'টি বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে ঃ যয়তুন ও ডালিম। যয়তুন একাধারে ফল ও তরকারি হয়ে থাকে। এর তৈল সর্বাধিক পরিষ্কার, স্বচ্ছ এবং অসংখ্য গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে থাকে। এটি হাজারো রোগের উত্তম প্রতিষেধক। এমনিভাবে ডালিমেরও অনেক গুণাগুণ সবার জানা আছে। এ দুই প্রকার ফল উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ অর্থাৎ, এদের প্রত্যেকটির কিছু ফল রং ও স্বাদের দিক দিয়ে সাদৃশ্যশীল হয় এবং কিছু ফলের রং, স্বাদ ও পরিমাণ একই রূপ হয় এবং ভিন্ন ভিন্নও হয়। যয়তুনের অবস্থাও তদ্রূপ।

এসব বৃক্ষ ও ফল সম্পর্কে উল্লেখ করার পর মানুষের প্রতি দু'টি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রথম নির্দেশ মানুষের বাসনা ও প্রবৃত্তির দাবীর পরিপূরক। বলা হয়েছে ঃ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ অর্থাৎ, এসব বৃক্ষের ও শস্যক্ষেত্রের ফল ভক্ষণ কর, যখন এগুলো ফলন্ত হয়। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এসব বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ সৃষ্টি করে সৃষ্টিকর্তা নিজের কোন প্রয়োজন মেটাতে চান না; বরং তোমাদেরই উপকারের জন্যে এগুলো সৃষ্টি করেছেন। অতএব, তোমরা খাও এবং উপকৃত হও। اِذَآ اَثْمَرَ বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, বৃক্ষের ডাল থেকে ফল বের করা তোমাদের সাধ্যাতীত কাজ। কাজেই আল্লাহ্র নির্দেশে যখন ফল বের হয়ে আসে, তখনই তোমরা তা খেতে পার–পরিপক্ব হোক বা না হোক।

ক্ষেতের ওশর ঃ দ্বিতীয় নির্দেশ এই দেয়া হয়েছে ঃ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ শব্দের অর্থ আন অথবা আদায় কর। ফসল কাটা কিংবা ফল নামানোর সময়কে حصاد বলা হয়। শব্দের সর্বনাম পূর্বোল্লেখিত প্রত্যেকটি খাদ্য বস্তুর দিকে যেতে পারে। বাক্যের অর্থ এই যে, এমন বস্তু খাও, পান কর এবং ব্যবহার কর; কিন্তু মনে রাখবে যে, ফসল কাটা কিংবা ফল নামানোর সময় এদের হকও আদায় করতে হবে। 'হক' বলে ফকীর-মিসকীনকে দান করা বুঝানো হয়েছে ঃ وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ অর্থাৎ, সৎ লোকদের ধন-সম্পদে নির্দিষ্ট হক রয়েছে ফকীর-মিসকীনদের।

এখানে সাধারণ সদকা-খয়রাত বোঝানো হয়েছে না ক্ষেতের যাকাত ও ওশর বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের দু'রকম উক্তি রয়েছে। কেউ কেউ প্রথমোক্ত মত প্রকাশ করে প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ এবং যাকাত মদীনায় হিজরত করার দুই বছর পর ফরয হয়েছে। তাই এখানে 'হক' -এর অর্থ ক্ষেতের যাকাত হতে পারে না। পক্ষান্তরে কেউ কেউ আয়াতটিকে মদীনায় অবতীর্ণ বলেছেন এবং حق -এর অর্থ যাকাত ও ওশর নিয়েছেন।

তফসীরবিদ ইবনে-কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এবং ইবনে আরাবী উন্দুলুসী 'আহকামুল-কারআনে'-এর সিদ্ধান্ত দিয়ে বলেছেন যে, আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হোক অথবা মদীনায়, উভয় অবস্থাতেই এ আয়াত থেকে শস্যক্ষেত্রের যাকাত অর্থাৎ, ওশর অর্থ নেয়া যেতে পারে। কেননা, তাঁদের মতে যাকাতের নির্দেশ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। সূরা মুযযাম্মেলের আয়াতে যাকাতের নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে। এ সূরাটি সর্বসম্মতিক্রমে মক্কায় অবতীর্ণ। তবে যাকাতের পরিমাণ ও নেসার নির্ধারণের নির্দেশ হিজরতের পর অবতীর্ণ হয়েছে। আলোচ্য আয়াত থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, ক্ষেতের উৎপন্ন ফসলের উপর আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে একটি হক আরোপ করা হয়েছে। এর পরিমাণ আয়াতে উল্লেখিত হয়নি। কাজেই পরিমাণের ব্যাপারে আয়াতটি সংক্ষিপ্ত। মক্কায় পরিমাণ নির্ধারণের প্রয়োজনও ছিল না। কেননা, ক্ষেত ও বাগানের ফসল অনায়াসে লাভ করার ব্যাপারে তখন মুসলমানরা নিশ্চিত ছিলেন না। তাই পূর্ব থেকে সৎলোকদের মধ্যে যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাই অনুসৃত হত। অর্থাৎ, ফসল কাটা ও ফল নামানোর সময় যেসব গরীব-মিসকীন সেখানে উপস্থিত থাকত, তাদেরকে কিছু দান করা হত। কোন বিশেষ পরিমাণ নির্ধারিত ছিল না। ইসলামপূর্ব কালে অন্যান্য উম্মতের মধ্যেও ফল ও

ফসল এভাবে দান করার প্রথা إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ কোরআন পাকের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। হিজরতের দু'বছর পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) যেমন অন্যান্য ধন-সম্পদের যাকাত ও নেসাবের পরিমাণ ওহীর নির্দেশক্রমে বর্ণনা করেন, তেমনিভাবে ফসলের যাকাতও বর্ণনা করেন। মুয়ায ইবনে জাবাল, ইবনে ওমর ও জাবের ইবনে আবদুল্লাহ(রাঃ) প্রমুখের রেওয়ায়েতক্রমে বিষয়টি সব হাদীসগ্রন্থে এভাবে বর্ণিত রয়েছেঃ ما سقت السماء ففيه العشر وما سقى بالسانية فنصف العشر অর্থাৎ, যেসব ক্ষেতে জল সেচনের ব্যবস্থা নেই শুধু বৃষ্টির পানির উপর নির্ভর করতে হয়, সেসব ক্ষেতের উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে দান করা ওয়াজেব এবং যেসব ক্ষেত কূপের পানি দ্বারা সেচ করা হয়, সেগুলোর উৎপন্ন ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ ওয়াজেব।

ইসলামী শরীয়ত যাকাত আইনে সর্বত্র এ বিষয়টিকে মূলনীতি হিসাবে ব্যবহার করেছে। যে ফসলে পরিশ্রম ও ব্যয় কম, তার যাকাতের পরিমাণ বেশী এবং পরিশ্রম ও ব্যয় যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, যাকাতের পরিমাণও সে পরিমাণে হ্রাস পায়। উদাহরণতঃ যদি কেউ কোন লুক্কায়িত ধনভাণ্ডার পেয়ে বসে কিংবা সোনা-রূপা ইত্যাদির খনি আবিষ্কৃত হয়, তবে তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে দান করা ওয়াজেব। কেননা, এখানে পরিশ্রম ও ব্যয় কম এবং উৎপাদন বেশী। এরপর বৃষ্টি বিধৌত ক্ষেতের নম্বর আসে। এতে পরিশ্রম ও ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম। তাই এর যাকাত পাঁচ ভাগের একের অর্ধেক—অর্থাৎ, দশ ভাগের এক ধার্য করা হয়েছে। এরপর রয়েছে ঐ ক্ষেত, যা কূপ থেকে সেচের মাধ্যমে কিংবা খালের পানি ক্রয় করে সিক্ত করা হয়। এতে পরিশ্রম ও খরচ বেড়ে যায়। ফলে এর যাকাত তারও অর্ধেক। অর্থাৎ, বিশ ভাগের এক ভাগ ধার্য করা হয়েছে। এরপর আসে সাধারণ সোনা-রূপা ও পণ্যসামগ্রীর পালা। এগুলো অর্জন করতে পরিশ্রম ও ব্যয় অত্যধিক। এ জন্যে এগুলোর যাকাত তারও অর্ধেক অর্থাৎ, চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ধার্য করা হয়েছে।

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসে ক্ষেতের ফসলের জন্যে কোন নেসাব নির্ধারিত হয়নি। তাই ইমাম আবু হানীফা ও আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর মাযহাব এই যে, ক্ষেতের ফসল কম হোক কিংবা বেশী, সর্বাবস্থায় তার যাকাত বের করা জরুরী। সূরা বাকারার যে আয়াতে ক্ষেতের যাকাত উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেও এর কোন নেসাব বর্ণিত হয়নি। বলা হয়েছেঃ أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ – অর্থাৎ, স্বীয় হালাল উপার্জন থেকে ব্যয় কর এবং ঐ ফসল থেকে, যা আমি তোমাদের জন্যে ক্ষেত-খামার থেকে উৎপন্ন করেছি।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) পণ্য-সামগ্রী ও চতুষ্পদ জন্তুর নেসাব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, রূপা সাড়ে বায়ান্ন তোলার কম হলে যাকাত নেই। ছাগল ১০০ এবং উট ৫-এর কম হলে যাকাত নেই। কিন্তু ক্ষেতের ফসল সম্পর্কে পূর্বোল্লেখিত হাদীসে কোন নেসাব ব্যক্ত করা হয়নি। তাই প্রত্যেক ক্ষেতের ফসলের উপরই উৎপাদনের পরিমাণ অনুসারে দশ ভাগের এক ভাগ কিংবা বিশ ভাগের এক যাকাত দেয়া ওয়াজেব।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ অর্থাৎ, সীমাতিরিক্ত ব্যয় করো না। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না। এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ্র পথে যদি কেউ সমস্ত ধন-সম্পদ বরং জীবনও ব্যয় করে দেয়, তবে একে অপব্যয় বলা যায় না; বরং যথার্থ প্রাপ্য পরিশোধ হয়েছে এরূপ বলাও কঠিন। এমতাবস্থায় এখানে অপব্যয় করতে নিষেধ করার উদ্দেশ্য কি? উত্তর এই যে, বিশেষ কোন ক্ষেত্রে অপব্যয়ের ফল স্বভাবতঃ অন্যান্য ক্ষেত্রে ত্রুটিরূপে দেখা দেয় যে ব্যক্তি স্বীয় কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে মুক্তহস্তে সীমাতিরিক্ত ব্যয় করে, সে সাধারণতঃ অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করতে ত্রুটি করে। এখানে এরূপ ত্রুটি করতেই বারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, যদি কেউ একই ক্ষেত্রে স্বীয় যথাসর্বস্ব লুটিয়ে দিয়ে রিক্তহস্ত হয়ে বসে, তবে পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন বরং নিজের প্রাপ্য কিরূপে পরিশোধ করবে? তাই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র পথে ব্যয়ও সুষম হওয়া চাই, যাতে সবার প্রাপ্য পরিশোধ করা সম্ভব হয়।

ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۚ مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ؕ
قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ
اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ نَبِّـُٔوْنِىْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٤٣﴾
وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ
حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ
اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ وَصّٰىكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ
افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا
يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٤﴾ قُلْ لَّاۤ اَجِدُ فِىْ مَاۤ اُوْحِىَ اِلَىَّ
مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗۤ اِلَّاۤ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ
دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا
اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ
رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤٥﴾ وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ
ذِىْ ظُفُرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَاۤ
اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَاۤ اَوِ الْحَوَايَاۤ اَوْ مَا اخْتَلَطَ
بِعَظْمٍ ؕ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿١٤٦﴾

(১৪৩) সৃষ্টি করেছেন আটটি নর ও মাদী। ভেড়ার মধ্যে দুই প্রকার ও ছাগলের মধ্যে দুই প্রকার। জিজ্ঞেস করুন, তিনি কি উভয় নর হারাম করেছেন, না উভয় মাদীকে? না যা উভয় মাদীর পেটে আছে? তোমরা আমাকে প্রমাণসহ বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (১৪৪) সৃষ্টি করেছেন উটের মধ্যে দুই প্রকার এবং গরুর মধ্যে দুই প্রকার। আপনি জিজ্ঞেস করুন ঃ তিনি কি উভয় নর হারাম করেছেন, না উভয় মাদীকে, না যা উভয় মাদীর পেটে আছে? তোমরা কি উপস্থিত ছিলে, যখন আল্লাহ্ এ নির্দেশ দিয়েছিলেন? অতএবক সে ব্যক্তি অপেক্ষা বেশী অত্যাচারী কে, যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা পোষণ করে যাতে করে মানুষকে বিনা প্রমাণে পথভ্রষ্ট করতে পারে? নিশ্চয় আল্লাহ্ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। (১৪৫) আপনি বলে দিন ঃ যা কিছু বিধান ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে পৌঁছেছে, তন্মধ্যে আমি কোন হারাম খাদ্য পাই না কোন ভক্ষণকারীর জন্যে, যা সে ভক্ষণ করে; কিন্তু মৃত অথবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের মাংস-এটা অপবিত্র অথবা অবৈধ; যবেহ করা জন্তু, যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়। অতঃপর যে ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে এমতাবস্থায় যে অবাধ্যতা করে না এবং সীমালঙ্ঘন করে না, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা ক্ষমাশীল দয়ালু। (১৪৬) ইহুদীদের জন্যে আমি প্রত্যেক নখবিশিষ্ট জন্তু হারাম করেছিলাম এবং ছাগল ও গরু থেকে এতদুভয়ের চর্বি আমি তাদের জন্যে হারাম করেছিলাম, কিন্তু ঐ চর্বি, যা পৃষ্ঠে কিংবা অন্ত্রে সংযুক্ত থাকে অথবা অস্থির সাথে মিলিত থাকে। তাদের অবাধ্যতার কারণে আমি তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম। আর আমি অবশ্যই সত্যবাদী।

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ ۚ وَلَا يُرَدُّ
بَاْسُهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٤٧﴾ سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا
لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَاۤ اَشْرَكْنَا وَلَاۤ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَىْءٍ ؕ
كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذَاقُوْا بَاْسَنَا ؕ
قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا ؕ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ
اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُوْنَ ﴿١٤٨﴾ قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ
فَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٤٩﴾ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ
الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا
فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ
يَعْدِلُوْنَ ﴿١٥٠﴾ قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا
تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوْۤا
اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ
حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿١٥١﴾

(১৪৭) যদি তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে বলে দিন ঃ তোমার প্রতিপালক সুপ্রশস্ত করুণার মালিক। তাঁর শাস্তি অপরাধীদের উপর থেকে টলবে না। (১৪৮) এখন মুশরেকরা বলবে ঃ যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন, তবে না আমরা শিরক করতাম, না আমাদের বাপ-দাদারা এবং না আমরা কোন বস্তুকে হারাম করতাম। এমনিভাবে তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছে, এমন কি তারা আমার শাস্তি আস্বাদন করেছে। আপনি বলুন ঃ তোমাদের কাছে কি কোন প্রমাণ আছে, যা আমাদেরকে দেখাতে পার? তোমরা শুধুমাত্র আন্দাজের অনুসরণ কর এবং তোমরা শুধু অনুমান করে কথা বল। (১৪৯) আপনি বলে দিন ঃ অতএব, পরিপূর্ণ যুক্তি আল্লাহ্‌রই। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে পথ প্রদর্শন করতেন। (১৫০) আপনি বলুন ঃ তোমাদের সাক্ষীদেরকে আন, যারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ তাআলা এগুলো হারাম করেছেন। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে আপনি এ সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না এবং তাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না, যারা আমার নির্দেশাবলীকে মিথ্যা বলে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না এবং যারা স্বীয় প্রতিপালকের সমতুল্য অংশীদার করে। (১৫১) আপনি বলুন ঃ এস, আমি তোমাদেরকে ঐসব বিষয় পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন। তা এই যে, আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করো না, পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করো, স্বীয় সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের কারণে হত্যা করো না-আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার দেই-নির্লজ্জতার কাছেও যেয়ো না, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য, যাকে হত্যা করা আল্লাহ্ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না; কিন্তু ন্যায়ভাবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা বুঝ।

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى
يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ
نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ
وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٥٢﴾
وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٥٣﴾
ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيْٓ اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا
لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٥٤﴾
وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُوْنَ ﴿١٥٥﴾ اَنْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ
مِنْ قَبْلِنَا ۠ وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ ﴿١٥٦﴾ اَوْ تَقُوْلُوْا
لَوْ اَنَّآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّآ اَهْدٰى مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ
جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ
مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ؕ سَنَجْزِي الَّذِيْنَ
يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ﴿١٥٧﴾

(১৫২) এতীমদের ধন-সম্পদের কাছেও যেয়ো না; কিন্তু উত্তম পন্থায়-যে পর্যন্ত সে বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়। ওজন ও মাপ পূর্ণ কর ন্যায় সহকারে। আমি কাউকে তার সাধ্যের অতীত কষ্ট দেই না। যখন তোমরা কথা বল, তখন সুবিচার কর, যদিও সে আত্মীয়ও হয়। আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার পূর্ণ কর। (১৫৩) তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হও। (১৫৪) অতঃপর আমি মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছি, সৎকর্মীদের প্রতি নেয়ামতপূর্ণ করার জন্যে, প্রত্যেক বস্তুর বিশদ বিবরণের জন্যে, হেদায়াতের জন্যে এবং করুণার জন্যে— যাতে তারা স্বীয় পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতে বিশ্বাসী হয়। (১৫৫) এটি এমন একটি গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি, খুব মঙ্গলময়, অতএব, এর অনুসরণ কর এবং ভয় কর— যাতে তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হও। (১৫৬) এ জন্যে যে, কখনও তোমরা বলতে শুরু কর ঃ গ্রন্থ তো কেবল আমাদের পূর্ববর্তী দু' সম্প্রদায়ের প্রতিই অবতীর্ণ হয়েছে এবং আমরা সেগুলোর পাঠ ও পঠন সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। (১৫৭) কিংবা বলতে শুরু কর ঃ যদি আমাদের প্রতি কোন গ্রন্থ অবতীর্ণ হত, আমরা এদের চাইতে অধিক পথপ্রাপ্ত হতাম। অতএব, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ, হেদায়েত ও রহমত এসে গেছে। অতঃপর সে ব্যক্তির চাইতে অধিক অনাচারী কে হবে, যে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে এবং গা বাঁচিয়ে চলে। অতি সত্বর আমি তাদেরকে শাস্তি দেব, যারা আমার আয়াতসমূহ থেকে গা বাঁচিয়ে চলে— জঘন্য শাস্তি তাদের গা বাঁচানোর কারণে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের পূর্বে প্রায় দু'তিন রুকূতে অব্যাহতভাবে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে যে, গাফেল ও মূর্খ মানুষ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্-প্রেরিত আইন পরিত্যাগ করে পৈতৃক ও মনগড়া কুপ্রথাকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ্ তাআলা যেসব বস্তু হারাম করেছিলেন, সেগুলোকে তারা বৈধ মনে করে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ কর্তৃক হালালকৃত অনেক বস্তুকে তারা নিজেদের জন্যে হারাম করে নিয়েছে এবং কোন কোন বস্তুকে শুধু পুরুষদের জন্যে হালাল, স্ত্রীদের জন্যে হারাম করেছে। আবার কোন কোন বস্তুকে স্ত্রীদের জন্যে হালাল, পুরুষদের জন্যে হারাম করেছে।

আলোচ্য তিন আয়াতে সেসব বস্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে, যেগুলোকে আল্লাহ্ তাআলা হারাম করেছেন। বিশদ বর্ণনায় নয়টি বস্তুর উল্লেখ হয়েছে। এরপর দশম নির্দেশ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ অর্থাৎ, এ ধর্মই হচ্ছে আমার সরল পথ। এ পথের অনুসরণ কর। এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) – এর আনীত ও বর্ণিত ধর্মের প্রতি ইঙ্গিত করে সমস্ত হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয, মকরূহ ও মোস্তাহাব বিষয়কে এ ধর্মে ন্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ধর্ম যে বিষয়কে হালাল বলেছে, তাকে হালাল এবং যে বিষয়কে হারাম বলেছে, তাকে হারাম মনে করবে— নিজের পক্ষ থেকে হালাল-হারামের ফতোয়া জারি করবে না।

আলোচ্য আয়াতসমূহে যে দশটি বিষয় বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর আসল লক্ষ্য হচ্ছে হারাম বিষয়সমূহ বর্ণনা করা। কাজেই সবগুলোকে নিষেধাজ্ঞার ভঙ্গিতে বর্ণনা করাই ছিল সঙ্গত, কিন্তু কোরআন পাক স্বীয় বিজ্ঞজনোচিত পদ্ধতি অনুসারে তন্মধ্যে কয়েকটি বিষয়কে ধনাত্মকভাবে আদেশের ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। তার উদ্দেশ্য এই যে, এর বিপরীত করা হারাম। (কাশ্শাফ) এর তাৎপর্য পরে জানা যাবে। আয়াতে বর্ণিত দশটি হারাম বিষয় হচ্ছে এই ঃ

(১) আল্লাহ্ তাআলার সাথে এবাদত ও আনুগত্যে কাউকে অংশীদার স্থির করা, (২) পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার না করা, (৩) দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা করা, (৪) অশ্লীল কাজ করা, (৫) কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, (৬) এতীমের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাৎ করা, (৭) ওজন ও মাপে কম দেয়া, (৮) সাক্ষ্য, ফয়সালা অথবা অন্যান্য কথাবার্তায় অবিচার করা (৯) আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার পূর্ণ না করা এবং (১০) আল্লাহ্ তাআলার সোজা-সরল পথ ছেড়ে অন্য পথ অবলম্বন করা।

আলোচ্য আয়াতসমূহের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ঃ তওরাত বিশেষজ্ঞ কা'বে আহবার পূর্বে ইহুদী ছিলেন, অতঃপর মুসলমান হয়ে যান। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কিতাব তওরাত বিস্‌মিল্লাহ্‌র পর কোরআন পাকের এসব আয়াত দ্বারাই শুরু হয়, যেগুলোতে দশটি হারাম বিষয় বর্ণিত হয়েছে। আরও বর্ণিত আছে যে, এ দশটি বাক্যই হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতিও অবতীর্ণ হয়েছিল।

তফসীরবিদ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ সূরা আলে এমরানে মুহ্‌কাম আয়াতের বর্ণনায় এ আয়াতগুলোকেই বুঝানো হয়েছে। হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষ নবী (সাঃ) পর্যন্ত সব পয়গম্বরের শরীয়তই এসব আয়াত সম্পর্কে একমত। কোন ধর্ম ও শরীয়তে এগুলোর কোনটিই মনসুখ বা রহিত হয়নি।— (তফসীর

বাহ্‌রে-মুহীত)

এসব আয়াত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ওছীয়তনামা ঃ তফসীর ইবনে কাছীরে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মোহরাঙ্কিত ওছিয়তনামা দেখতে চায়, সে যেন এ আয়াতগুলো পাঠ করে। এসব আয়াতে ঐ ওছিয়ত বিদ্যমান, যা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আল্লাহ্‌র নির্দেশে উম্মতকে দিয়েছেন।

হাকেম হযরত ওবাদা ইবনে ছামেতের রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ কে আছে যে আমার হাতে তিনটি আয়াতের আজ্ঞানুবর্তী হওয়ার শপথ করবে? অতঃপর তিনি আলোচ্য তিনটি আয়াত তেলওয়াত করে বললেন ঃ যে ব্যক্তি এ শপথ পূর্ণ করবে, তাকে পুরস্কৃত করা আল্লাহ্‌র দায়িত্ব।

এবার দশটি বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা এবং আয়াতত্রয়ের তফসীর লক্ষ্য করুন। আয়াতগুলোর সূচনা এভাবে করা হয়েছে ঃ قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ শব্দের অর্থ 'এস'। আসলে উচ্চস্থানে দণ্ডায়মান হয়ে নিম্নের লোকদেরকে নিজের কাছে ডাকা অর্থে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ দাওয়াত কবুল করার মধ্যেই তাদের জন্যে শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য বিদ্যমান। এখানে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে বলুন ঃ এস, যাতে আমি তোমাদেরকে ঐসব বিষয় পাঠ করে শুনাতে পারি যেগুলো আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন। এটা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত বার্তা। এতে কারও কল্পনা, আন্দাজ ও অনুমানের কোন প্রভাব নেই; যাতে তোমরা এসব বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করতে যত্নবান হও এবং অনর্থক নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র হালালকৃত বিষয়সমূহকে হারাম না কর।

এ আয়াতে যদিও সরাসরি মক্কার মুশরেকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু বিষয়টি ব্যাপক হওয়ার কারণে সমগ্র মানবজাতিই এর আওতাধীন— মুমিন হোক কিংবা কাফের, আরব হোক কিংবা অনারব, উপস্থিত লোকজন হোক কিংবা অনাগত বংশধর।— (বাহ্‌রে-মুহীত)

সর্বপ্রথম মহাপাপ শিরক, যা হারাম করা হয়েছে ঃ এরূপ সযত্ন সম্বোধনের পর হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের তালিকায় সর্বপ্রথম বলা হয়েছে ঃ অর্থাৎ, اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا সর্বপ্রথম কাজ এই যে, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক ও অংশীদার করো না। আরবের মুশরেকদের মত দেব-দেবীদেরকে বা মূর্তিকে খোদা মনে করো না। ইহুদী ও খ্রীস্টানদের মত পয়গম্বরগণকে খোদা কিংবা খোদার পুত্র বলো না। অন্যদের মত ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যা বলে আখ্যা দিয়ো না। মূর্খ জনগণের মত পয়গম্বর ও ওলীগণকে জ্ঞান ও শক্তি সামর্থ্যে আল্লাহ্‌র সমতুল্য সাব্যস্ত করো না।

শিরকের সংজ্ঞা ও প্রকার ভেদ ঃ তফসীরে-মাযহারীতে বলা হয়েছেঃ এখানে شَيْئًا এর অর্থ এরূপ হতে পারে যে, 'জলী' অর্থাৎ, প্রকাশ্য শিরক ও প্রচ্ছন্ন শিরক— এ প্রকারদ্বয়ের মধ্য থেকে কোনটিতেই লিপ্ত হয়ো না। প্রকাশ্য শিরকের অর্থ সবাই জানে যে, এবাদত আনুগত্য অথবা অন্য কোন বিশেষ গুণে অন্যকে আল্লাহ্ তাআলার সমতুল্য অথবা তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করা। প্রচ্ছন্ন শিরক এই যে, নিজ কাজ-কর্মে ধর্মীয় ও পার্থিব উদ্দেশ্যসমূহে এবং লাভ-লোকসানে আল্লাহ্ তাআলাকে কার্যনির্বাহী বলে বিশ্বাস করেও কার্যতঃ অন্যান্যকে কার্যনির্বাহী মনে করা এবং যাবতীয় প্রচেষ্টা অন্যদের সাথেই জড়িত রাখা। এছাড়া লোক দেখানো এবাদত করা, অন্যদেরকে দেখানোর জন্যে নামায ইত্যাদি ঠিকমত পড়া, নাম-যশ লাভের উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করা অথবা কার্যতঃ লাভ-লোকসানের মালিক আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে সাব্যস্ত করা ইত্যাদিও প্রচ্ছন্ন শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

মোটকথা, প্রকাশ্য প্রচ্ছন্ন উভয় প্রকার শিরক থেকেই বেঁচে থাকা দরকার। প্রতিমা ইত্যাদির পূজাপাট যেমন শিরকের অন্তর্ভুক্ত, তেমনি পয়গম্বর ও ওলীদেরকে জ্ঞান ও শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি গুণে আল্লাহ্ তাআলার সমতুল্য মনে করাও অন্যতম শিরক। আল্লাহ্ না করুন, যদি কারও বিশ্বাস এরূপ হয়, তবে তা প্রকাশ্য শিরক। আর বিশ্বাস এরূপ না হয়ে কাজ এরূপ করলে তা হবে প্রচ্ছন্ন শিরক। এ স্থলে সর্বপ্রথম শিরক থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কারণ, শিরকের অপরাধ সম্পর্কে কোরআন পাকের সিদ্ধান্ত এই যে, এর ক্ষমা নাই।

দ্বিতীয় গোনাহ্ পিতা-মাতার সাথে অসদ্ব্যবহার ঃ বর্ননা করা হয়েছে ঃ وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا অর্থাৎ, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। উদ্দেশ্য এই যে, পিতা-মাতার অবাধ্যতা করো না। তাদেরকে কষ্ট দিও না; কিন্তু বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যহার কর। এতে এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, পিতা-মাতার অবাধ্যতা না করা এবং কষ্ট না দেয়াই যথেষ্ট নয়; বরং সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখা ফরয। কোরআন পাকের অন্যত্র এ কথাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ

এ আয়াতে পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া শিরকের পর দ্বিতীয় পর্যায়ের অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন, অন্য এক আয়াতে তাদের আনুগত্য ও সুখবিধানকে আল্লাহ্ তাআলার এবাদতের সাথে সংযুক্ত করে বলা হয়েছে ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا অর্থাৎ, তোমার পালনকর্তা ফয়সালা করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও এবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ, আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং পিতা-মাতার। অতঃপর আমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অর্থাৎ, বিপরীত করলে শাস্তি পাবে।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, সর্বোত্তম কাজ কোনটি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ নামায মুস্তাহাব সময়ে পড়া। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন ঃ এরপর কোন্‌টি উত্তম? উত্তর হল ঃ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার। আবার প্রশ্ন হল ঃ এরপর কোন্‌টি? উত্তর হল ঃ আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ।

ছহীহ্ মুসলিমে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বাচনিক বর্ণিত আছেঃ একদিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তিনবার বললেনঃ رغم انفه ، رغم انفه ، رغم انفه অর্থাৎ, লাঞ্ছিত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! কে লাঞ্ছিত হয়েছে? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না।

তৃতীয় হারাম ঃ সন্তান হত্যা ঃ আয়াতে বর্ণিত তৃতীয় হারাম বিষয় হচ্ছে সন্তান হত্যা। এখানে পূর্বাপর সম্পর্ক এই যে, ইতিপূর্বে

পিতা-মাতার হক বর্ণিত হয়েছে, যা সন্তানের কর্তব্য। এখন সন্তানের হক বর্ণিত হচ্ছে, যা পিতা-মাতার কর্তব্য। জাহেলিয়াত যুগে সন্তানকে জীবন্ত পুঁতে ফেলা কিংবা হত্যা করার ব্যাপারটি ছিল সন্তানের সাথে অসদ্ব্যবহারের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। আয়াতে তা নিষিদ্ধ করে বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ অর্থাৎ, দারিদ্র্যের কারণে স্বীয় সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমি তোমাদেরকে এবং তাদেরকে — উভয়কেই জীবিকা দান করব।

জাহেলিয়াত যুগে এ নিকৃষ্টতম নির্দয়-পাষণ্ড প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে কাউকে জামাতা করার লজ্জা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশে তাকে জীবন্ত পুঁতে ফেলা হতো। মাঝে মাঝে জীবিকা নির্বাহ কঠিন হবে মনে করে পাষণ্ডরা নিজ হাতে সন্তানদেরকে হত্যা করত। কোরআন পাক এ কু-প্রথা রহিত করে দিয়েছে। উল্লেখিত আয়াতে তাদের সেই মানসিক ব্যাধিরও প্রতিকার বর্ণিত হয়েছে, যে কারণে তারা এ ঘৃণ্য অপরাধে লিপ্ত হত। সন্তানের পানাহারের সংস্থান কোথা থেকে হবে, এ ভাবনাই ছিল তাদের মানসিক রোগ। আল্লাহ্ তাআলা আয়াতে ব্যক্ত করেছেন যে, পানাহার করানো এবং জীবিকা প্রদানের আসল দায়িত্ব তোমাদের নয়, এ কাজ সরাসরি আল্লাহ্ তাআলার। তোমরা স্বয়ং জীবিকা ও পানাহারে তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি দিলে তোমরা সন্তানদেরকেও দিয়ে থাক। তিনি না দিলে তোমাদের কি সাধ্য যে, একটি গম অথবা চালের দানা নিজে সৃষ্টি করবে। শক্ত মাটির বুক চিরে বীজকে অঙ্কুরিত করা, অতঃপর তাকে বৃক্ষের আকার দান করা, অতঃপর ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ করা কার কাজ? পিতা-মাতা এ কাজ করতে পারে কি? এগুলো সব সর্বশক্তিমানের কুদরতের কারসাজি। একাজে মানুষের কোন হাত নেই। সে শুধু মাটিকে নরম করতে এবং চারা গজালে পানি দিতে পারে। কিন্তু ফুল-ফল সৃষ্টিতে তার বিন্দুমাত্রও হাত নেই। অতএব, পিতা-মাতার এ ধারণা অমূলক যে, তারা সন্তানদেরকে রিযিক দান করে। বরং আল্লাহ্ তাআলার অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে পিতা-মাতাও পায় এবং সন্তানরাও। তাই এখানে প্রথমে পিতা-মাতার উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে,আমি তোমাদেরকেও রিযিক দেব এবং তাদেরকেও। এতে আরও ইঙ্গিত হতে পারে যে, তোমাদেরকে রিযিক এজন্যে দেয়া হয়, যাতে তোমরা সন্তানদেরকে পৌঁছে দাও। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন انما تنصرون وترزقون بضعفائكم অর্থাৎ, তোমাদের দুর্বল ও অক্ষম লোকদের কারণে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের সাহায্য করেন ও রিযিক দান করেন।

সূরা ইস্‌রায়ও এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে রিযিকের ব্যাপারে প্রথম সন্তানের উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ অর্থাৎ, আমি তাদেরকেও রিযিক দেব এবং তোমাদেরকেও। এতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমার কাছে রিযিকের প্রথম হকদার দুর্বল ও অক্ষম সন্তানরা। তাদের খাতিরেই তোমাদেরকেও দেয়া হয়।

সন্তানের শিক্ষা ও চরিত্রগঠন না করা এবং ধর্মবিমুখতার জন্যে স্বাধীন ছেড়ে দেয়া ও এক প্রকার সন্তান হত্যা ঃ আয়াতে বর্ণিত সন্তান হত্যা যে অপরাধ ও কঠোর গোনাহ্ তা বাহ্যিক হত্যা ও মেরে ফেলার অর্থে তো সুস্পষ্টই। চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, সন্তানকে শিক্ষা-দীক্ষা না দেয়া এবং তার চরিত্র গঠন না করা, যদ্দরুন সে আল্লাহ্-রসূল ও পরকালের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে এবং চরিত্রহীন ও নির্লজ্জ কাজে জড়িত হয়ে পড়ে, এটাও সন্তান হত্যার চাইতে কম মারাত্মক নয়। কোরআন পাকের ভাষায় সে ব্যক্তি মৃত, যে আল্লাহ্‌কে চিনে না এবং তাঁর আনুগত্য করে না। اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ আয়াতে তাই বর্ণিত হয়েছে। যারা সন্তানদের কাজ-কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের প্রতি মনোযোগ দেয় না, তাদেরকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয় কিংবা এমন ভ্রান্ত শিক্ষা দেয়, যার ফলে ইসলামী চরিত্র ধ্বংস হয়ে যায়, তারাও একদিক দিয়ে সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী। বাহ্যিক হত্যার প্রভাবে তো শুধু ক্ষণস্থায়ী জাগতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়। কিন্তু এ হত্যা মানুষের পারলৌকিক ও চিরস্থায়ী জীবনের মূলেও কুঠারাঘাত করে।

চতুর্থ হারাম নির্লজ্জ কাজ ঃ আয়াতে বর্ণিত চতুর্থ হারাম বিষয় হচ্ছে নির্লজ্জ কাজ। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ অর্থাৎ, প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন, যে কোন রকম অশ্লীলতার কাছেও যেয়ো না।

فاحشة ও فحشاء ، فحش শব্দটি فاحشة এর বহুবচন। সবগুলো ধাতু। এগুলোর অর্থ সাধারণতঃ অশ্লীলতা ও নির্লজ্জ হয়। কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এসব শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন সব কাজ, যার অনিষ্টতা ও খারাবী সুদূর প্রসারী। ইমাম রাগেব 'মুফরাদাতুল'-কোরআন' গ্রন্থে এবং ইবনে আসীর নেহায়াহ্ গ্রন্থে এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। কোরআন পাকের বিভিন্ন জায়গায় এসব কাজের নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ অন্যত্র বলা হয়েছেঃ حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ

যাবতীয় বড় গোনাহ্ فحش ও فحشاء এর অর্থের অন্তর্ভুক্ত, তা উক্তি সম্পর্কিত হোক কিংবা কর্ম সম্পর্কিত, বাহ্যিক হোক কিংবা আভ্যন্তরীণ। এছাড়া আত্মিক ব্যভিচার ও নির্লজ্জতার যাবতীয় কাজও এর অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই সাধারণ ভাষায় এ শব্দটি ব্যভিচারের অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোরআনের আলোচ্য আয়াতে নির্লজ্জ কাজসমূহের কাছে যেতেও নিষেধ করা হয়েছে। ব্যাপক অর্থ নেয়া হলে যাবতীয় বদঅভ্যাস, মুখ, হাত, পা ও অন্তরের যাবতীয় গোনাহ্‌ই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত অর্থ ব্যভিচার নেয়া হলে আয়াতে ব্যভিচার ও তার ভূমিকা এবং কারণসমূহ বুঝানো হয়েছে।

এ আয়াতেই فواحش এর ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে ঃ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ প্রথমোক্ত অর্থ অনুযায়ী বাহ্যিক فواحش এর অর্থ হবে হাত, পা ইত্যাদি দ্বারা সম্পন্ন গোনাহ্ এবং আভ্যন্তরীণ فواحش এর অর্থ হবে অন্তর সম্পর্কিত গোনাহ্। যেমন -হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, অকৃতজ্ঞতা, অধৈর্য ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী বাহ্যিক فواحش এর অর্থ এমন ব্যভিচার যা প্রকাশ্যে করা হয়। আর আভ্যন্তরীণের অর্থ যে ব্যভিচার গোপনে করা হয়। ব্যভিচারের ভূমিকাও প্রকাশ্য ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত। কু-নিয়তে পর নারীকে দেখা, হাতে স্পর্শ করা এবং তার সাথে প্রেমালাপ করা এরই অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে ব্যভিচার সম্পর্কিত যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা, সংকল্প এবং গোপন কৌশল অবলম্বন আভ্যন্তরীণ ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ বাহ্যিক নির্লজ্জতার অর্থ সাধারণভাবে প্রচলিত অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজকর্ম এবং আভ্যন্তরীণ নির্লজ্জতার অর্থ আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টিতে নির্লজ্জ কাজ-কর্ম, যদিও

সাধারণভাবে মানুষ সেগুলোকে খারাপ মনে করে না কিংবা সেগুলো যে হারাম, তা সাধারণ মানুষ জানে না। উদাহরণতঃ স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়ার পরও তাকে স্ত্রী হিসেবে রেখে দেয়া কিংবা হালাল নয় এরূপ মহিলাকে বিয়ে করা।

মোটকথা, এ আয়াত নির্লজ্জতার প্রকৃত অর্থের দিক দিয়ে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সমস্ত গোনাহ্‌কে এবং সাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধ অর্থের দিক দিয়ে ব্যভিচারের প্রকাশ্য ও গোপন সকল পন্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এ সম্পর্কে নির্দেশ এই যে, এগুলোর কাছেও যেয়ো না। কাছে না যাওয়ার অর্থ এরূপ মজলিস ও স্থান থেকে বেঁচে থাকা যেখানে গেলে গোনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং এরূপ কাজ থেকেও বেঁচে থাক, যদ্দ্বারা এসব গোনাহ্‌র পথ খুলে যায়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه অর্থাৎ, যে লোক নিষিদ্ধ জায়গার আশপাশে ঘুরাফেরা করে, সে তাতে প্রবেশ করার কাছাকাছি হয়ে যায়।

পঞ্চম হারাম বিষয় অন্যায় হত্যা ঃ এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না, তবে ন্যায়ভাবে। এ 'ন্যায়ভাবে' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ তিনটি কারণ ছাড়া কোন মুসলমানের খুন হালাল নয়। (এক) বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচারে লিপ্ত হলে, (দুই) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে তার কেছাছ হিসেবে তাকে হত্যা করা যাবে এবং (তিন) সত্যধর্ম ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গেলে।

খলিফা হযরত ওসমান গনী (রাঃ) যখন বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হন এবং বিদ্রোহীরা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তখনও তিনি তাদেরকে এ হাদীস শুনিয়ে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্‌র রহমতে আমি এ তিনটি কারণ থেকেই মুক্ত। মুসলমান হয়ে তো দূরের কথা, জাহেলিয়াত যুগেও আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হইনি, আমি কোন খুন করিনি, স্বীয় ধর্ম ইসলাম ত্যাগ করব— এরূপ কল্পনাও আমার মনে কখনও জাগেনি। এমতাবস্থায় তোমরা আমাকে কি কারণে হত্যা করতে চাও?

বিনা কারণে মুসলমানকে হত্যা করা যেমন হারাম, তেমনিভাবে এমন কোন অমুসলমানকে হত্যা করাও হারাম, যে কোন ইসলামী দেশের প্রচলিত আইন মান্য করে বসবাস করে কিংবা যার সাথে মুসলমানের চুক্তি থাকে।

তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্ গ্রন্থে হযরত আবু হোরায়রা রাঃ বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন যিম্মী অমুসলিমকে হত্যা করে, সে আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। যে আল্লাহ্ অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি সত্তর বছরের দূরত্ব পর্যন্ত পৌছে। এই একটি আয়াতে দশটির মধ্যে পাঁচটি হারাম বিষয়ের বর্ণনা দেয়ার পর বলা হয়েছে ঃ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ অর্থাৎ, এসব বিষয়ে তোমাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা জোর নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা বুঝ।

ষষ্ঠ হারাম এতীমের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করা ঃ দ্বিতীয় আয়াতে এতীমদের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করা যে হারাম, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ অর্থাৎ, এতীমের মালের কাছেও যেয়ো না ; কিন্তু উত্তম পন্থায়, যে পর্যন্ত না সে বয়োঃপ্রাপ্ত হয়ে যায়। এখানে অপ্রাপ্ত বয়স্ক এতীম শিশুদের অভিভাবককে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তারা যেন এতীমদের মালকে আগুন মনে করে এবং অবৈধভাবে তা খাওয়া ও নেয়ার কাছেও না যায়। অন্য এক আয়াতে অনুরূপ ভাষায়ই বলা হয়েছে যে, যারা এতীমদের মাল অন্যায় ও অবৈধভাবে ভক্ষণ করে, তারা নিজেদের পেটে আগুন ভর্তি করে।

তবে এতীমের মাল সংরক্ষণ করা এবং স্বভাবতঃ লোকসানের আশঙ্কা নেই— এরূপ কারবারে নিয়োগ করে তা বৃদ্ধি করা উত্তম ও জরুরী পন্থা। এতীমদের অভিভাবকের এ পন্থা অবলম্বন করাই উচিত।

এরপর এতীমের মাল সংরক্ষণের সীমা বর্ণনা করা হয়েছে, حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ অর্থাৎ, সে বয়োঃপ্রাপ্ত হয়ে গেলে অভিভাবকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। অতঃপর তার মাল তার কাছে সমর্পন করতে হবে।

اشد শব্দের প্রকৃত অর্থ শক্তি। আলেমগণের মতে বয়োঃপ্রাপ্ত হলেই এর সূচনা হয়। বালক-বালিকার মধ্যে বয়োঃপ্রাপ্তির লক্ষণ দেখা দিলে কিংবা বয়স পনের-ষোল বছর পূর্ণ হয়ে গেলে শরীয়ত মতে তাদেরকে বয়ঃপ্রাপ্ত বলা হবে।

তবে বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর দেখতে হবে, তার মধ্যে নিজের মালের রক্ষণা-বেক্ষণ এবং শুদ্ধ খাতে ব্যয় করার যোগ্যতা হয়েছে কিনা। যোগ্যতা দেখলে বয়োঃপ্রাপ্তির সাথে সাথে তার ধন-সম্পদ তার হাতে সমর্পণ করা হবে। অন্যথায় পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত ধন-সম্পদ হেফাযত করার দায়িত্ব অভিভাবকদের। ইতিমধ্যে যখনই ধন-সম্পদ সংরক্ষণ এবং কারবারের যোগ্যতা তার মধ্যে দেখা যাবে, তখনই তার ধন-সম্পদ তার হাতে সমর্পণ করতে হবে। যদি পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্তও তার মধ্যে এ যোগ্যতা সৃষ্টি না হয়, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে তার মাল তাকেই সমর্পণ করতে হবে যদি সে উন্মাদ না হয়। কোন কোন ইমামের মতে তখনও তার মাল তাকে দেয়া যাবে না, বরং শরীয়তের কাযী (বিচারক) তার মাল সংরক্ষণের জন্যে কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির হাতে সমর্পণ করবেন।

সপ্তম হারাম ওজন ও মাপে ত্রুটি করা ঃ এ আয়াতে সপ্তম নির্দেশ ওজন ও মাপ ন্যায়ভাবে পূর্ণ করা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। 'ন্যায়ভাবে' বলার উদ্দেশ্য এই যে, যে ওজন করে দেবে, সে প্রতিপক্ষকে কম দেবে না এবং প্রতিপক্ষ নিজ প্রাপ্যের চাইতে বেশী নেবে না। – (রুহুল-মা'আনী)

দ্রব্য আদান-প্রদানে ওজন ও মাপে কম-বেশী করাকে কোরআন কঠোর হারাম সাব্যস্ত করেছে। যারা এর বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের জন্য সূরা মুতাফফিফীনে কঠোর শাস্তিবাণী বর্ণিত হয়েছে।

তফসীরবিদ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যারা ব্যবসা-বাণিজ্যে ওজন ও মাপের কাজ করে, তাদেরকে সম্বোধন করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ ওজন ও মাপ এমন একটি কাজ যে, এতে অন্যায় আচরণ করে তোমাদের পূর্বে অনেক উম্মত আল্লাহ্‌র আযাবে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। তোমরা এ ব্যাপারে পুরোপুরি সাবধানতা অবলম্বন কর।-(ইবনে-কাছীর)

কর্মচারী ও শ্রমিকদের নির্ধারিত কর্তব্য কর্মে ত্রুটি করাও ওজন ও মাপে ত্রুটি করার অনুরূপ ঃ ওজন ও মাপে ত্রুটি করাকে কোরআন পাকে تطفيف বলা হয়েছে। এটা শুধু ওজন করার সময় কমবেশী করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং অন্যের প্রাপ্যে ত্রুটি করাও تطفيف এর অন্তর্ভুক্ত। ইমাম মালেক (রহঃ) স্বীয় মুয়াত্তা গ্রন্থে হযরত ওমর (রাঃ)

থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তিকে নামাযের আরকানে ত্রুটি করতে দেখে তিনি বলেছিলেন ঃ তুমি **تطفيف** করেছ, অর্থাৎ, যথার্থ প্রাপ্য শোধ করনি। এ ঘটনা বর্ণনা করে ইমাম মালেক বলেন ঃ **لكل شئ وفاء وتطفيف** অর্থাৎ, প্রাপ্য পুরোপুরি দেয়া ও ত্রুটি করা প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যেই হয় – শুধু ওজন ও মাপের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ নয়।

এতে বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি কর্তব্য কর্ম পূর্ণ করে না, সময় চুরি করে কিংবা কাজে ত্রুটি করে, সে-ও উপরোক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত; সে কোন মন্ত্রী হোক প্রশাসক হোক কিংবা সাধারণ কর্মচারী হোক অথবা ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মে নিয়োজিত হোক না কেন।

এরপর বলা হয়েছে ঃ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا অর্থাৎ, আমি কোন ব্যক্তিকে তার সাধ্যাতিরিক্ত কাজের নির্দেশ দেই না। কোন কোন হাদীসে এর অর্থ এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি সাধ্যমত পুরোপুরি ওজন করে, এতদসত্ত্বেও যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে ওজনে কমবেশী হয়ে যায়, তবে তা মাফ। কেননা, এটা তার শক্তি ও সাধ্যের বাইরে।

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে ঃ এ বাক্য যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রাপ্য পরিশোধের সময় কিছু বেশী দেয়াই সতর্কতা– যাতে কর্মের সন্দেহ না থাকে, যেমন এরূপ স্থলেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ওজনকারীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ঃ زن وارجح অর্থাৎ, ওজন কর এবং কিছু ঝুঁকিয়ে ওজন কর। – (আহ্মদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর সাধারণ অভ্যাস তাই ছিল। তিনি কারও প্রাপ্য পরিশোধ করার সময় প্রাপ্যের চাইতে বেশী দেয়া পছন্দ করতেন।

অষ্টম নির্দেশ ন্যায় ও সুবিচারের বিপরীত করা হারাম ঃ বলা হয়েছে ঃ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ অর্থাৎ, তোমরা যখন কথা বলবে, তখন ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে, যদি সে আত্মীয়ও হয়।' এখানে বিশেষ কোন কথার উল্লেখ নাই। তাই সাধারণ তফসীরবিদগণের মতে সব রকম কথাই এর অন্তর্ভুক্ত। কোন ব্যাপারের সাক্ষ্য হোক কিংবা বিচারকের ফয়সালা হোক অথবা পারস্পরিক বিভিন্ন প্রকার কথাবার্তাই হোক– সব ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় ন্যায় ও সত্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে কথা বলতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মোকদ্দমার সাক্ষ্যে কিংবা ফয়সালার ক্ষেত্রে ন্যায় ও সত্য কায়েম রাখার অর্থ এই যে, ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে যা জানা আছে, নিজের পক্ষ থেকে কমবেশী না করে তা পরিষ্কার বলে দেয়া– অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে কোন কথা না বলা এবং এতে কারও উপকার কিংবা কারও অপকারের ভ্রূক্ষেপ না করা। মোকদ্দমার ফয়সালার সাক্ষীদেরকে শরীয়তের নীতি অনুযায়ী যাচাই করার পর তাদের সাক্ষ্য ও অন্যান্য সূত্র দ্বারা যা প্রমাণিত হয়, তাই ফয়সালা করা। সাক্ষ্য ও ফয়সালায় কারও বন্ধুত্বও ভালবাসা এবং কারও শত্রুতা ও বিরোধিতা সত্য বলার পথে অন্তরায় না হওয়া উচিত। এ কারণেই আয়াতে وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ বাক্যটি যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, যার মোকদ্দমার সাক্ষ্য দিবে কিংবা ফয়সালা করবে, সে তোমার নিকটাত্মীয়ের হলেও ন্যায় ও সত্যকে কোন অবস্থাতেই হাতছাড়া করবে না।

মিথ্যা সাক্ষ্য ও অসত্য ফয়সালা প্রতিরোধ করাই এ আয়াতের উদ্দেশ্য। মিথ্যা সাক্ষ্য সম্পর্কে আবু দাউদ ও ইবনে মাজায় নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত রয়েছে ঃ – মিথ্যা সাক্ষ্য শেরেকীর সমতুল্য।'

নবম নির্দেশ ঃ আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করা ঃ বলা

হয়েছে ঃ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এর অর্থ ঐ অঙ্গীকারও হতে পারে, যা রূহের জগতে অবস্থান করার সময় প্রত্যেক মানুষের কাছ থেকে নেয়া হয়েছে। তখন সব মানুষকে বলা হয়েছিল أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই?) তখন সবাই সমস্বরে উত্তর দিয়েছিল ঃ بَلَىٰ (অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে আপনি আমাদের পালনকর্তা)। এ অঙ্গীকারের দাবী হল এই যে, পালনকর্তার কোন নির্দেশ অমান্য করা যাবে না। তিনি যে কাজের আদেশ দেন, তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তিনি যে কাজে নিষেধ করেন, তার কাছেও যাওয়া যাবে না এবং সন্দেহযুক্ত কাজ থেকেও বাঁচতে হবে। অঙ্গীকারের সারকথা এই যে, আল্লাহ্ তাআলার পুরোপুরি আনুগত্য করতে হবে।

এছাড়া এর অর্থ কোরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত বিশেষ বিশেষ অঙ্গীকারও হতে পারে। বর্ণিত তিনটি আয়াত এদের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর তফসীর করা হচ্ছে এবং যেগুলোতে দশটি নির্দেশ তাকীদ সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে।

আলেমগণ বলেন ঃ নযর, মান্নত ইত্যাদি পূর্ণ করাও এ অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত। এতে অমুক কাজ করব কিংবা করব না বলে মানুষ আল্লাহ্ তাআলার সাথে অঙ্গীকার করে। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও একথা পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে يُوفُونَ بِالنَّذْرِ অর্থাৎ, আল্লাহ্র সৎ বান্দারা স্বীয় মান্নত পূর্ণ করে।

মোটকথা, এ নবম নির্দেশটি গণনার দিক দিয়ে নবম হলেও স্বরূপের দিক দিয়ে শরীয়তের যাবতীয় আদেশ–নিষেধের মধ্যে পরিব্যপ্ত।

এ আয়াতের শেষভাগে বলা রয়েছে ঃ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে এসব কাজের জোর নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।

দশম নির্দেশ ঃ

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ

অর্থাৎ, এ শরীয়তে মুহাম্মদী হল আমার সরল পথ। অতএব, তোমরা এ পথে চল এবং অন্য কোন পথে চলো না। কেননা, সেসব পথ তোমাদেরকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।

এখানে هَٰذَا শব্দ দ্বারা দ্বীনে ইসলাম অথবা কোরআনের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। সূরা আনআমের প্রতিও ইশারা হতে পারে। কেননা, তাতেও ইসলামের যাবতীয় মূলনীতি, তৌহীদ, রেসালত এবং মূল বিধি-বিধান ব্যক্ত হয়েছে। مُسْتَقِيمٌ শব্দটি صِرَاطٌ এর বিশেষণ। কিন্তু ব্যাকরণিক দিক দিয়ে একে বর্তমান কাল বাচক উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সরল হওয়া ইসলামের একটি অপরিহার্য বিশেষণ। এরপর বলা হয়েছেঃ فَاتَّبِعُوهُ অর্থাৎ, ইসলামই যখন আমার পথ এবং এটাই যখন সরল পথ, তখন মনযিলে–মকছুদের (অভিষ্ট লক্ষ্যের) সোজা পথ হাতে এসে গেছে। তাই এ পথেই চল।

هل ينظرون الا ان تأتيهم الملئكة او يأتي ربك او يأتي
بعض ايت ربك يوم يأتي بعض ايت ربك لا ينفع نفسا
ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل
انتظروا انا منتظرون ١٥٨ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا
لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا
يفعلون ١٥٩ من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء
بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون ١٦٠ قل انني
هدىني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابرهيم
حنيفا وما كان من المشركين ١٦١ قل ان صلاتي ونسكي و
محياي ومماتي لله رب العلمين ١٦٢ لا شريك له وبذلك امرت
وانا اول المسلمين ١٦٣ قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء
ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى
ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ١٦٤ وهو الذي
جعلكم خلئف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجت ليبلوكم
في ما اتىكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم ١٦٥

(১৫৮) তারা শুধু এ বিষয়ের দিকে চেয়ে আছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আগমন করবে কিংবা আপনার পালনকর্তা আগমন করবেন অথবা আপনার পালনকর্তার কোন নির্দেশ আসবে। যেদিন আপনার পালনকর্তার কোন নিদর্শন আসবে, সেদিন এমন কোন ব্যক্তির বিশ্বাস স্থাপন তার জন্যে ফলপ্রসূ হবে না, যে পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোনরূপ সৎকর্ম করেনি। আপনি বলে দিন ঃ তোমরা পথের দিকে চেয়ে থাক, আমরাও পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম। (১৫৯) নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপার আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সমর্পিত। অতঃপর তিনি বলে দেবেন যা কিছু তারা করে থাকে। (১৬০) যে একটি সৎকর্ম করবে, সে তার দশগুণ পাবে এবং যে একটি মন্দ কাজ করবে, সে তার সমান শাস্তিই পাবে। বস্তুতঃ তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। (১৬১) আপনি বলে দিন ঃ আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করেছেন— একাগ্রচিত্ত ইবরাহীমের বিশুদ্ধ ধর্ম। সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (১৬২) আপনি বলুন ঃ আমার নামায, আমার কোরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। (১৬৩) তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল। (১৬৪) আপনি বলুন ঃ আমি কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য প্রতিপালক খোঁজব, অথচ তিনিই সবকিছুর প্রতিপালক? যে ব্যক্তি কোন গোনাহ্ করে, তা তারই দায়িত্বে থাকে। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। অতঃপর তোমাদেরকে সবাইকে প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে বলে দিবেন, যেসব বিষয়ে তোমরা বিরোধ করতে। (১৬৫) তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন এবং একে অন্যের উপর মর্যাদা সমুন্নত করেছেন, যাতে তোমাদেরকে এ বিষয়ে পরীক্ষা করেন, যা তোমাদেরকে দিয়েছেন। আপনার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদাতা এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু।

– এরপর বলা হয়েছে ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله সবুল শব্দটি سبيل এর বহুবচন। এর অর্থও পথ। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ পর্যন্ত পোঁছা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের আসল পথ তো একটিই, জগতে যদিও মানুষ নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী অনেক পথ করে রেখেছে। তোমরা সেসব পথে চলো না। কেননা, সেগুলো বাস্তবে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে না। কাজেই যে এসব পথে চলবে সে আল্লাহ্ থেকে দূরেই সরে পড়বে।

তফসীর-মাযহারীতে বলা হয়েছে ঃ কোরআন পাক ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রেরণ করার আসল উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা, ইচ্ছা ও পছন্দকে কোরআন ও সুন্নাহর ছাঁচে ঢেলে নিক এবং স্বীয় জীবনকে এরই অনুসারী করে নিক। কিন্তু বাস্তব হচ্ছে এই যে, মানুষ কোরআন ও সুন্নাহকে নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা ও পছন্দের ছাঁচে ঢেলে নিতে চাচ্ছে। কোন আয়াত কিংবা হাদীসকে নিজের মতলব বা ধারণার বিপরীতে দেখলে তারা তার মনগড়া ব্যাখ্যা করে স্বীয় প্রবৃত্তির পক্ষে নিয়ে যায়। এখান থেকেই অন্যান্য বেদাত ও পথভ্রষ্টতার জন্ম। আয়াতে এসব পথ থেকে বেঁচে থাকতেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

গাফেল থাকার কারণ এটা নয় যে, তওরাত ও ইঞ্জীল আরবী ভাষায় ছিল না, অনুবাদের মাধ্যমে বিষয়বস্তু জানা সম্ভবপর ও বাস্তবসম্মত। বরং কারণ এই যে, আহ্‌লে-কিতাবরা আরবদের শিক্ষা ও একত্ববাদের ব্যাপারে কখনও যত্নবান হয়নি। ঘটনাচক্রে কোন বিষয়বস্তু পাঠ করাই হুঁশিয়ার হওয়ার ব্যাপারে ততটুকু কার্যকর নয়। তবে এতটুকু হুঁশিয়ারীর কারণে একত্ববাদের জ্ঞান অনুসন্ধান ও তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা ওয়াজেব হয়ে যায় এবং এ কারণেই একত্ববাদ বর্জন করার জন্য আরবদেরকে শাস্তি দেয়া সম্ভবপর ছিল। এতে একথা জরুরী হয় না যে, তাহলে হযরত মূসা ও ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়ত ব্যাপক ও সবার জন্য ছিল। এরূপ নয়, বরং এ ধরনের ব্যাপকতা আমাদের পয়গম্বর মুহম্মদ (সাঃ)-এরই বৈশিষ্ট্য এবং তা মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখা উভয়ের সমষ্টির দিক দিয়ে। নতুবা মূলনীতিতে সকল পয়গম্বরের অনুসরণই সব মানুষের জন্যে জরুরী। সুতরাং এ দিক দিয়ে আরবদেরকে শাস্তি দেয়া অশুদ্ধ হত না; কিন্তু আয়াতে বর্ণিত অজুহাতটি বাহ্যদৃষ্টিতে পেশ করা সম্ভবপর ছিল। এখন তারও অবকাশ রইল না এবং আল্লাহ্‌র যুক্তি পূর্ণ হয়ে গেল।

দ্বিতীয় উক্তি او تقولوا لو انا انزل علينا الكتب لكنا اهدى منهم সম্পর্কে একটি প্রশ্ন ও উত্তর নবুওয়তের বিরতিকালে অবস্থান করার কারণে যারা মুক্তি পাবে, তাদের সম্পর্কে সূরা মায়েদার তৃতীয় রুকূর শেষ দিকে বর্ণিত হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা আনআমের অধিকাংশই মক্কাবাসী ও আরব-মুশরেকদের বিশ্বাস ও ক্রিয়াকর্মের সংস্কার এবং তাদের সন্দেহ ও প্রশ্নের জওয়াবে অবতীর্ণ হয়েছে।

গোটা সূরায় এবং বিশেষভাবে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মক্কা ও আরবের অধিবাসীদের সামনে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তোমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মো'জেযা ও প্রমাণাদি দেখে নিয়েছ, তাঁর সম্পর্কে পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও পয়গম্বরগণের ভবিষ্যদ্বাণীও শুনে নিয়েছ এবং একজন নিরক্ষরের মুখ থেকে কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াত শোনার মো'জেযাটিও লক্ষ্য করেছ। এখন ন্যায় ও সত্যের সমুদয় পথ তোমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেছে।

অতএব, বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে আর কিসের অপেক্ষা?

এ বিষয়টি আলোচ্য আয়াতে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে বলা হয়েছেঃ

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِيَ

بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ

অর্থাৎ, তারা কি বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে এ জন্যে অপেক্ষা করছে যে, মৃত্যুর ফেরেশতা তাদের কাছে পৌঁছবে! না কি হাশরের ময়দানের জন্যে অপেক্ষা করছে, যেখানে প্রতিদান ও শাস্তির ফয়সালা করার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং আগমন করবেন অথবা কিয়ামতের কোন একটি সর্বশেষ নিদর্শন দেখে নেয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে? ফয়সালার জন্যে কিয়ামতের ময়দানে পালনকর্তার উপস্থিতি কোরআন পাকের একাধিক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্ তাআলা কিভাবে এবং কি অবস্থায় উপস্থিত হবেন, তা মানবজ্ঞান পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম। তাই এ ধরনের আয়াত সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম ও পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের অভিমত এই যে, কোরআনে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তাই বিশ্বাস করতে হবে। উদাহরণতঃ এ আয়াতে বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের ময়দানে প্রতিদান ও শাস্তির মীমাংসা করার জন্যে উপস্থিত হবেন। তবে কি অবস্থায় উপস্থিত হবেন এবং কোন দিকে অবস্থান করবেন এ আলোচনা অর্থহীন।

অতঃপর "যেদিন আপনার পালনকর্তার কোন কোন নিদর্শন এসে যাবে.....।"

এতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলার কোন কোন নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পর তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি ইতিপূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করেনি, তখন বিশ্বাস স্থাপন করলে তা কবুল করা হবে না এবং যে ব্যক্তি পূর্বেই বিশ্বাস স্থাপন করেছে; কিন্তু কোন সৎকর্ম করেনি, সে তখন তওবা করে ভবিষ্যতে সৎকর্ম করার ইচ্ছা করলে তার তওবাও কবুল করা হবে না। মোটকথা, কাফের স্বীয় কুফর থেকে এবং পাপাচারী স্বীয় পাপাচার থেকে যদি তখন তওবা করতে চায়, তবে তা কবুল হবে না।

কারণ, বিশ্বাস স্থাপন ও তওবা যতক্ষণ মানুষের ইচ্ছাধীন থাকে, ততক্ষণই তা কবুল হতে পারে। আল্লাহ্র শাস্তি ও পরকালের স্বরূপ ফুটে উঠার পর প্রত্যেক মানুষ বিশ্বাস স্থাপন ও তওবা করতে আপনা থেকেই বাধ্য হবে। বলাবাহুল্য, এরূপ ঈমান ও তওবা গ্রহণযোগ্য নয়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ যখন কেয়ামতের সর্ব শেষ নির্দশনটি প্রকাশিত হবে অর্থাৎ, সূর্য পূর্বদিকের পরিবর্তে পশ্চিমদিক থেকে উদিত হবে, তখন এ নির্দশনটি দেখা মাত্রই সারা বিশ্বের মানুষ ঈমানের কালেমা পাঠ করতে শুরু করবে এবং সব অবাধ্য লোকও অনুগত হয়ে যাবে। কিন্তু তখনকার ঈমান ও তওবা গ্রহণীয় হবে না।— (বগভী)

এ আয়াত থেকে একথা জানা গেল যে, কেয়ামতের কোন কোন নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পর তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। তখন আর কোন কাফের কিংবা ফাসেকের তওবা কবুল হবে না। কিন্তু এ নিদর্শন কোন্‌টি, কোরআন পাক তা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেনি।

ছহীহ্ মুসলিমে এর বিস্তারিত বিবরণে হুযায়ফা ইবনে ওসায়দ (রাঃ)–এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার সাহাবায়ে কেরাম পরস্পর কেয়ামতের লক্ষণাদি সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেনঃ দশটি নিদর্শন না দেখা পর্যন্ত কেয়ামত হবে না। (এক) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়। (দুই) বিশেষ এক প্রকার ধোঁয়া, (তিন) দাব্বাতুল–আরদ, (চার) ইয়াজুয-মাজুযের আবির্ভাব (পাঁচ) ঈসা (আঃ)–এর অবতরণ, (ছয়) দাজ্জালের অভ্যুদয়, (সাত,আট,নয়) প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ও আরব উপদ্বীপ-এ তিন জায়গায় মাটি ধসে যাওয়া এবং (দশ) আদন থেকে একটি আগুন বেরিয়ে মানুষকে সামনের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া। মসনদ–আহমদে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)–এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ এসব নিদর্শনের মধ্যে সর্বপ্রথম নিদর্শনটি হল পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ও দাব্বাতুল–আরদের আবির্ভাব।

ইমাম কুরতুবী তাযকেরা গ্রন্থে এবং হাফেয ইবনে হাজার বুখারীর টীকায় হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)–এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ এ ঘটনার অর্থাৎ, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পর একশ বিশ বছর পর্যন্ত পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে।— (রুহুল-মা'আনী)

এ বিবরণ দৃষ্টে প্রশ্ন হয় যে, ঈসা (আঃ)–এর অবতরণের পর ছহীহ্ রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি মানব জাতিকে ঈমানের দাওয়াত দেবেন এবং মানুষ ঈমান কবুল করবে। ফলে সমগ্র বিশ্বে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। যদি তখনকার ঈমান গ্রহণীয় না হয়, তবে এ দাওয়াত এবং মানুষের ইসলাম গ্রহণ অর্থহীন হয়ে যায় না কি?

তফসীর রুহুল–মা'আনীতে এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের ঘটনাটি ঈসা (আঃ)–এর অবতরণের অনেক পরে হবে। তওবার দরজা তখন থেকেই বন্ধ হবে; ঈসা (আঃ)–এর অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে নয়।

সূরা আল্–আনআমের অধিকাংশই মক্কার মুশরেকদেরকে সম্বোধন এবং তাদের প্রশ্ন ও উত্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এতে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, এখন আল্লাহ্ তাআলার সোজাপথ একমাত্র কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর অনুসরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পূববর্তী পয়গম্বরগণের যুগে যেমন তাঁদের ও তাঁদের গ্রন্থ ও শরীয়তের অনুসরণের উপর মুক্তি নির্ভরশীল ছিল, তেমনি আজ শুধু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর শরীয়তের নির্দেশ মেনে চলার মধ্যেই মুক্তি সীমাবদ্ধ। কাজেই তোমরা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দাও এবং সোজা–সরল পথ ছেড়ে এদিক–ওদিক ভ্রান্তপথ অবলম্বন করো না। এসব পথ তোমাদেরকে আল্লাহ্ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে মুশরেক, ইহুদী, খ্রস্টান ও মুসলমান সবাইকে ব্যাপকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাদেরকে আল্লাহ্র সরল পথ পরিহার করার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কে বলা হয়েছে যে, এসব ভ্রান্ত পথের মধ্যে কিছু সরল পথের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখীও রয়েছে ; যেমন, মুরেক ও আহলে–কিতাবদের অনুসৃত পথ এবং কিছু বিপরীতমুখী নয়, কিন্তু সরল পথ থেক বিচ্যুত করে ডানে–বামে নিয়ে যায়। এগুলো হচ্ছে সন্দেহযুক্ত ও বেদআতের পথ। এগুলোও মানুষকে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করে দেয়।

"যারা ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন পথ আবিষ্কার করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের কাজ আল্লাহ্ তাআলার নিকট সম্পর্কিত। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা তাদের কাছে তাদের কৃতকর্মসমূহ বিবৃত করবেন।

আয়াতে উল্লেখিত 'ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করা' এবং 'বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়ার' অর্থ ধর্মের মূলনীতিসমূহের অনুসরণ ছেড়ে স্বীয় ধ্যান-ধারণাও প্রবৃত্তি অনুযায়ী কিংবা শয়তানের ধোঁকা ও সন্দেহে লিপ্ত হয়ে ধর্মে কিছু নতুন বিষয় ঢুকিয়ে দেয়া অথবা কিছু বিষয় তা থেকে বাদ দেয়া।

ধর্মে বেদআত আবিষ্কার করার কারণে কঠোর শাস্তিবাণী ঃ তফসীর মাযহারীতে বলা হয়েছে— কিছু লোক ধর্মের মূলনীতি বর্জন করে সে জায়গায় নিজের পক্ষ থেকে কিছু বিষয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। এ উম্মতের বেদআতীরাও নতুন ও ভিত্তিহীন বিষয়কে ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। তারা সবাই আলোচ্য আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ বিষয়টি বর্ণনা করে বলেন ঃ বনী-ইসরাঈলরা যেসব অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল, আমার উম্মতও সেগুলোর সম্মুখীন হবে। তারা যেমন কর্মে লিপ্ত হয়েছিল, আমার উম্মতও তেমনি হবে। বনী-ইসরাঈলরা ৭২টি দলে বিভক্ত হয়েছিল, আমার উম্মতে ৭৩টি দল সৃষ্টি হবে। তন্মধ্যে একদল ছাড়া সবাই দোযখে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ মুক্তিপ্রাপ্ত দল কোন্‌টি? উত্তর হল ঃ যে দল আমার ও আমার সাহাবীদের পথ অনুসরণ করবে, তারাই মুক্তি পাবে।- (তিরমিযী, আবু দাউদ)

তিবরানী নির্ভরযোগ্য সনদ সহকারে হযরত ফারূকে আযম (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছিলেন ঃ এ আয়াতে বেদআতী, প্রবৃত্তির অনুসারী এবং নতুন পথের উদ্ভাবকদের কথা উল্লেখ রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকেও অনুরূপ উক্তি বর্ণিত আছে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ধর্মে নিজের পক্ষ থেকে নতুন নতুন পথ আবিষ্কার করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন।

ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী প্রমুখ ইরবায ইবনে সারিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ "তোমাদের মধ্যে যারা আমার পর জীবিত থাকবে, তারা বিস্তর মতানৈক্য দেখতে পাবে। তাই (আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি যে,) তোমরা আমার ও খোলাফায়ে-রাশেদীনের সুন্নতকে শক্তভাবে আঁকড়ে থেকো এবং তদনুযায়ী কাজ করে যেও। নতুন নতুন পথ থেকে সযত্নে গা বাঁচিয়ে চলো। কেননা, ধর্মে নতুন সৃষ্ট প্রত্যেক বিষয়ই বেদআত এবং প্রত্যেক বেদআতই পথভ্রষ্টতা।"

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ ছয় ব্যক্তির প্রতি আমি অভিসম্পাত করি, এবং আল্লাহ্ তাআলাও তাদের প্রতি অভিসম্পাত করুন। (এক) যে ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র গ্রন্থে কোন কিছু যোগ করে (তা শব্দই যোগ করুক কিংবা এমন কোন অর্থ যোগ করুক যা সাহাবায়ে কেরামের তফসীরের বিপরীত)। (দুই) যে ব্যক্তি তকদীরকে অস্বীকার করে। (তিন) যে ব্যক্তি জবরদস্তীমূলকভাবে মুসলানদের নেতা হয়ে যায়— যাতে ঐ ব্যক্তিকে সম্মানিত করে, যাকে আল্লাহ্ লাঞ্ছিত করেছেন এবং ঐ ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করে, যাকে আল্লাহ্ সম্মান দান করেছেন। (চার) যে ব্যক্তি আল্লাহ্ কর্তৃক হারামকৃত বস্তুকে হালাল মনে করে; অর্থাৎ, মক্কার হেরেমে খুন-খারাবি করে কিংবা শিকার করে। (পাঁচ) যে ব্যক্তি আমার বংশধর ও সন্তান-সন্ততির সম্মান হানি করে। (ছয়) যে ব্যক্তি আমার সুন্নত ত্যাগ করে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, সরল পথ থেকে বিমুখ ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ্ তাআলাই কেয়ামতের দিন শাস্তি দিবেন।

এ আয়াতে পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির একটি সহৃদয় বিধি বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি একটি সৎকাজ করবে, তাকে দশগুণ প্রতিদান দেয়া হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একটি গোনাহ্ করবে, তাকে শুধু এক গোনাহ্‌র সমান বদলা দেয়া হবে।

বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী ও মুসনাদে-আহমদে বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত দয়ালু। যে ব্যক্তি কোন সৎকাজের শুধু ইচ্ছা করে, তার জন্যে একটি নেকী লেখা হয়— ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করুক বা না করুক। অতঃপর যখন সে সৎকাজটি সম্পাদন করে, তখন তার আমলনামায় দশটি নেকী লেখা হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজের ইচ্ছা করে, অতঃপর তা কার্যে পরিণত না করে, তার আমলনামায়ও একটি নেকী লেখা হয়। অতঃপর যদি সে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করে, তবে একটি গোনাহ্ লেখা হয়। কিংবা একেও মিটিয়ে দেয়া হয়। এহেন দয়া ও অনুকম্পা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র দরবারে ঐ ব্যক্তিই ধ্বংস হতে পারে, যে ধ্বংস হতেই দৃঢ়সংকল্প।- (ইবনে-কাছীর)

এক হাদীসে কুদসীতে হযরত আবুবকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে— যে ব্যক্তি একটি সৎকাজ করে, সে দশটি সৎকাজের ছওয়াব পায় বরং আরও বেশী পায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একটি গোনাহ্ করে সে তার শাস্তি এক গোনাহ্‌র সম-পরিমাণ পায় কিংবা তাও আমি মাফ করে দিব। যে ব্যক্তি পৃথিবী ভর্তি গোনাহ্ করার পর আমার কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আমি তার সাথে ততটুকুই ক্ষমার ব্যবহার করব। "যে ব্যক্তি আমার দিকে অর্ধহাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে একহাত অগ্রসর হই এবং যে ব্যক্তি আমার দিকে একহাত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে বা' (অর্থাৎ, দুই বাহু প্রসারিত) পরিমাণ অগ্রসর হই। যে ব্যক্তি আমার দিকে লাফিয়ে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।"

এসব হাদীস থেকে জানা যায়, আয়াতে যে সৎকাজের প্রতিদান দশগুণ দেয়ার কথা বলা হয়েছে, তা সর্বনিম্ন পরিমাণ। আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় কৃপায় আরও বেশী দিতে পারেন এবং দিবেন। অন্যান্য হাদীস দ্বারা সত্তর গুণ বা সাতশ' গুণ পর্যন্ত প্রমাণিত রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতগুলো হচ্ছে সূরা আনআমের সর্বশেষ ছয় আয়াত। যারা সত্যধর্মে বাড়াবাড়ি ও কম-বেশী করে একে ভিন্ন ধর্মে রূপান্তরিত করেছিল এবং নিজেরা বিভিন্ন দলে ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তাদের মোকাবেলায় প্রথম তিন আয়াতে সত্যধর্মের বিশুদ্ধ চিত্র, মৌলিক নীতি এবং কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শাখাগত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম দু'আয়াতে মূলনীতি এবং তৃতীয় আয়াতে শাখাগত বিধান উল্লেখিত হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে একথা বলে দিন যে, আমাকে আমার পালনকর্তা একটি সরল পথ বাতলে দিয়েছেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আমি তোমাদের মত নিজ ধ্যান-ধারণা বা পৈতৃক কুপ্রথার অনুসারী হয়ে এ পথ অবলম্বন করিনি, বরং আমার পালনকর্তাই আমাকে এ পথ বাতলে দিয়েছেন। (পালনকর্তা) শব্দের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিশুদ্ধ পথ বলে দেয়া তাঁর পালনকর্তার একটি দাবী। তোমরাও ইচ্ছা কর তবে হেদায়েতের আয়োজন তোমাদের জন্যেও বিদ্যমান রয়েছে।

অতঃপর বলা হয়েছেঃ

دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ এখানে

قيام শব্দটি قيم ধাতুর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ, সুদৃঢ় অর্থাৎ, এ দ্বীন সুদৃঢ় যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত মজবুত ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত; কারও ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা নয় এবং যাতে সন্দেহ হতে পারে-এমন কোন নতুন ধর্মও নয়, বরং এটিই ছিল পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরের ধর্ম। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর নাম উল্লেখ করার কারণ এই যে, জগতের প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীই তাঁর মাহাত্ম্যে ও নেতৃত্বে বিশ্বাসী। বর্তমান সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ইহুদী, খ্রীস্টান ও আরবের মুশরেকরা পরস্পর যতই ভিন্ন মতাবলম্বী হোক না কেন, ইবরাহীম (আঃ)-এর মাহাত্ম্যে ও নেতৃত্বে সবাই একমত। নেতৃত্বের এ মহান পদমর্যাদা আল্লাহ্ তাআলা বিশেষভাবে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে দান করেছেন। বলা হয়েছেঃ ''আমি তোমাকে মানবজাতির নেতারূপে বরণ করব।''

তাদের মধ্যে প্রতিটি সম্প্রদায়ই একথা প্রমাণ করতে সচেষ্ট থাকত যে, তারা ইবরাহীমী ধর্মেই অটল রয়েছে এবং তাদের ধর্মই মিল্লাতে ইবরাহীম। তাদের এ বিভ্রান্তি দূর করার উদ্দেশে বলা হয়েছেঃ ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্যের উপাসনা থেকে বেঁচে থাকতেন এবং শিরকের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতেন। এটাই তাঁর সর্ববৃহৎ ও অক্ষয় কীর্তি। তোমাদের মধ্যে যখন ইহুদীরা ওযায়ের (আঃ)-কে খ্রীস্টানরা ঈসা (আঃ)-কে এবং আরবের মুশরেকরা হাজারো পাথরকে আল্লাহ্‌র অংশীদার করে নিয়েছে, তখন কারও একথা বলার অধিকার নেই যে, তারা ইবরাহীমী ধর্মের অনুসারী। অবশ্য বুক ফুলিয়ে একথা বলার অধিকার একমাত্র মুসলমানদেরই আছে। কারণ, তারা যাবতীয় শিরক ও কুফরের প্রতি বীতশ্রদ্ধ।

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ এখানে

نسك শব্দের অর্থ কোরবানী। হজ্বের ক্রিয়াকর্মকেও نسك বলা হয়। এ শব্দটি সাধারণ এবাদত-উপাসনার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাই ناسك শব্দটি عابد (এবাদতকারী) অর্থেও বলা হয়। আয়াতে এসব ক'টি অর্থই নেয়া যেতে পারে। তফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কাছ থেকেও এসব তফসীর বর্ণিত রয়েছে। তবে এখানে সাধারণ এবাদত অর্থ নেয়াই অধিক সঙ্গত মনে হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, আমার নামায, আমার সমগ্র এবাদত, আমার জীবন, আমার মরণ— সবই বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্যে নিবেদিত।

এখানে ধর্মের শাখাগত কাজকর্মের মধ্যে সর্ব প্রথম নামাযের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, এটি যাবতীয় সৎকর্মের প্রাণ ও ধর্মের স্তম্ভ। এরপর অন্যান্য সব কাজ ও এবাদত সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর সমগ্র জীবনের কাজকর্ম ও অবস্থা এবং সবশেষে মরণের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আমার এসব কিছুই একমাত্র বিশ্ব পালক আল্লাহ্‌র জন্যে নিবেদিত যার কোন শরীক নেই। এটিই হচ্ছে পূর্ণ বিশ্বাস ও পূর্ণ আন্তরিকতার ফল। মানুষ জীবনের প্রতিটি কাজে ও প্রতিটি অবস্থায় একথা মনে রাখবে যে, আমার এবং সমগ্র বিশ্বের একজন পালনকর্তা আছেন, আমি তাঁর দাস এবং সর্বদা তাঁর দৃষ্টিতে রয়েছি। আমার অন্তর, মস্তিষ্ক, চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা, কলম ও পদক্ষেপ তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া উচিত নয়। মানুষ যদি অন্তরে ও মস্তিষ্কে এ মোরাকাবা ও ধ্যানকে সদাসর্বদা উপস্থিত রাখে, তবে সে বিশুদ্ধ অর্থে পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত হতে পারে এবং যাবতীয় পাপ ও অপরাধ থেকে নির্মল ও পূতঃপবিত্র জীবন যাপন করতে পারে।

অতঃপর বলা হয়েছেঃ ''আমাকে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এরূপ ঘোষণা করার এবং আন্তরিকতা অবলম্বন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'' আর আমি সর্ব প্রথম অনুগত মুসলমান। উদ্দেশ্য এই যে, এ উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলমান আমি। কেননা, প্রত্যেক উম্মতের প্রথম মুসলমান স্বয়ং ঐ পয়গম্বরই হন যার প্রতি ওহী অবতরণ করা হয়। প্রথম মুসলমান হওয়া দ্বারা এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, সৃষ্ট জগতের মাঝে সর্বপ্রথম রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নূর সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর সমস্ত নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও অন্যান্য সৃষ্টজগত অস্তিত্ব লাভ করেছে। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন।- (রূহুল-মা'আনী)

একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করতে পারে না ঃ চতুর্থ আয়াতে মক্কার মুশরেক ওলীদ ইবনে মুগীরা প্রমুখের উত্তর দেয়া হয়েছে। তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে বলত ঃ তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে এলে আমরা তোমাদের যাবতীয় পাপের বোঝা বহন করব। বলা হয়েছে ঃ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ

অর্থাৎ, আপনি তাদেরকে বলে দিন ঃ তোমরা কি আমার কাছ থেকে এমন আশা কর যে, তোমাদের মত আমিও আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন পালনকর্তা অনুসন্ধান করব? অথচ তিনিই সারা জাহান ও সমগ্র সৃষ্ট জগতের পালনকর্তা। আমার কাছ থেকে এরূপ পথ-ভ্রষ্টতার আশা করা বৃথা। আমাদের পাপের বোঝা বহন করার যে কথা তোমরা বলছ, তা একান্তই একটি নির্বুদ্ধিতা। যে ব্যক্তি পাপ করবে, তারই আমলনামায় তা লেখা হবে এবং সে-ই এর শাস্তি ভোগ করবে। তোমাদের এ কথার কারণে পাপ তোমাদের দিকে স্থানান্তরিত হতে পারে না। যদি মনে করা হয় যে, হিসাব ও আমলনামায় তো তাদেরই থাকবে; কিন্তু হাশরের ময়দানে এর যে শাস্তি নির্ধারিত হবে, তা আমরা ভোগ করে নেব, তবে এ ধারণাকেও পরবর্তী আয়াত নাকচ করে দিয়েছে। বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন কেউ কারও পাপের বোঝা বহন করবে না।

এ আয়াত মুশরেকরের অর্থহীন উক্তির জওয়াব তো দিয়েছেই; সাথে সাথে সাধারণ মুসলমানদেরকেও এ নীতি বলে দিয়েছে যে, কেয়ামতের আইন-কানুন দুনিয়ার মত নয়। দুনিয়াতে কেউ অপরাধ করে তার দায়িত্ব অপরের ঘাড়ে চাপাতে পারে; যখন অপর পক্ষ তাতে সম্মত হয়। কিন্তু খোদায়ী আদালতে এর কোন অবকাশ নেই। সেখানে একজনের পাপের জন্য অন্য জনকে কিছুতেই পাকড়াও করা হবে না। এ আয়াতদৃষ্টেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ ব্যভিচারের ফলে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তার উপর পিতা-মাতার অপরাধের কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। এ হাদীসটি হাকেম হযরত আয়েশার (রাঃ) রেওয়ায়েতক্রমে বিশুদ্ধ সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন।

সূরা আল-আনআম সমাপ্ত

سُوْرَةُ الْاَعْرَافِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَتَانِ وَسِتُّ اٰيٰتٍ وَّاَرْبَعَ عَشَرَ رُكُوْعًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓصٓ ﴿١﴾ كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ
مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢﴾ اِتَّبِعُوْا مَاۤ اُنْزِلَ
اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ۗ قَلِيْلًا مَّا
تَذَكَّرُوْنَ ﴿٣﴾ وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا
اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ ﴿٤﴾ فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَاۤ اِلَّاۤ اَنْ
قَالُوْۤا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٥﴾ فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ
وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٦﴾ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا
غَآئِبِيْنَ ﴿٧﴾ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ ِالْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٨﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ
الَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ ﴿٩﴾ وَلَقَدْ
مَكَّنّٰكُمْ فِي الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيْلًا مَّا
تَشْكُرُوْنَ ﴿١٠﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ
اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ۗ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ﴿١١﴾

সূরা আল আ'রাফ
মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ২০৬
আল্লাহ্র নামে শুরু, যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।।

(১) আলিফ, লাম, মীম, ছোয়াদ। (২) এটি একটি গ্রন্থ, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে করে আপনি এর মাধ্যমে ভীতি-প্রদর্শন করেন। অতএব, এটি পৌছে দিতে আপনার মনে কোনরূপ সংকীর্ণতা থাকা উচিত নয়। আর এটি বিশ্বাসীদের জন্যে উপদেশ। (৩) তোমরা অনুসরণ কর, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্য সাথীদের অনুসরণ করো না। (৪) আর তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর। অনেক জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদের কাছে আমার আযাব রাত্রি বেলায় পৌছেছে অথবা দ্বিপ্রহরে বিশ্রামরত অবস্থায়। (৫) অনন্তর যখন তাদের কাছে আমার আযাব উপস্থিত হয়, তখন তাদের কথা এই ছিল যে, তারা বলল ঃ নিশ্চয় আমরা অত্যাচারী ছিলাম। (৬) অতএব, আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞেস করব যাদের কাছে রসূল প্রেরিত হয়েছিল এবং আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করব রসূলগণকে। (৭) অতঃপর আমি স্বজ্ঞানে তাদের কাছে অবস্থা বর্ণনা করব বস্তুতঃ আমি অনুপস্থিত তো ছিলাম না। (৮) আর সেদিন যথার্থই ওজন হবে। অতঃপর যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই সফলকাম হবে। (৯) এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে, তারাই এমন হবে, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে। কেননা, তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করতো। (১০) আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠাঁই দিয়েছি এবং তোমাদের জীবিকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। (১১) আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরপর আকার-অবয়ব, তৈরী করেছি। অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছি – আদমকে সেজদা কর তখন সবাই সেজদা করেছে; কিন্তু ইবলীস সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

সূরা আল আ'রাফ

সূরার বিষয়-সংক্ষেপ

সমগ্র সূরা আ'রাফের প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, এ সূরার অধিকাংশ বিষয়বস্তুই পরকাল ও রেসালতের সাথে সম্পৃক্ত। প্রথম আয়াত كِتٰبٌ اُنْزِلَ নবুওয়তের এবং ষষ্ঠ আয়াতে فَلَنَسْـَٔلَنَّ পরকালের সত্যতা সম্পর্কিত। চতুর্থ রুকূর অর্ধেক থেকে ষষ্ঠ রুকূর শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ পরকালের আলোচনা রয়েছে। অতঃপর অষ্টম রুকূ থেকে ২১ তম রুকূ পর্যন্ত আম্বিয়া (আঃ) ও তাঁদের উম্মতের ব্যাপারাদি বর্ণিত হয়েছে। এগুলো সবই রেসালতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এসব কাহিনীতে রেসালতে অবিশ্বাসীদের শাস্তির কথাও বর্ণনা করা হয়েছে– যাতে বর্তমান অবিশ্বাসীরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। ২২ তম রুকূর অর্ধেক থেকে ২৩ রুকূর শেষ পর্যন্ত পরকাল সম্পর্কিত বিষয়ের পুনরালোচনা করা হয়েছে। শুধু সপ্তম ও ২২ তম রুকূর শুরুতে এবং সর্ব শেষ ২৪ তম রুকূর বেশীর ভাগ অংশে তওহীদ সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা। এ সূরার খুব কম অংশই এমন আছে যাতে স্থানোপযোগী শাখাগত বিধি-বিধান আলোচিত হয়েছে। – (বয়ানুল – কোরআন)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ – প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ এ কোরআন আল্লাহ্র গ্রন্থ, যা আপনার কাছে প্রেরিত হয়েছে। এর কারণে আপনার অন্তরে কোন সংকোচ থাকা উচিত নয়। অন্তরের সংকোচন অর্থ হল কোরআন পাক ও এর নির্দেশাবলী প্রচারের ক্ষেত্রে কারও ভয়ভীতি অন্তরায় না হওয়া উচিত যে, মানুষ এর প্রতি মিথ্যারোপ করবে এবং আপনাকে কষ্ট দেবে। – (মাযহারী)

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যিনি আপনার প্রতি এ গ্রন্থ নাযিল করেছেন, তিনি আপনার সাহায্য এবং হেফাযতেরও ব্যবস্থা করেছেন। কাজেই আপনি মনকে সংকোচিত করবেন কেন? কারো কারো মতে এখানে অন্তরের সংকোচনের অর্থ এই যে, কোরআন ও ইসলামী বিধি-বিধান শুনেও যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দয়ার কারণে মর্মাহত হতেন। একেই মানসিক সংকোচ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে ঃ আপনার কর্তব্য শুধু দ্বীনের প্রচার করা। এটা করার পর কে মুসলমান হলো আর কে হলো না– এ দায়িত্ব আপনার নয়।

فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ – অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন সর্বসাধারণকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, আমি তোমাদের কাছে রসূল ও গ্রন্থসমূহ প্রেরণ করেছিলাম, তোমরা তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিলে? পয়গম্বরগণকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ যেসব বার্তা ও বিধান দিয়ে আমি আপনাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম, সেগুলো আপনারা নিজ নিজ উম্মতের কাছে পৌছিয়েছেন কি না? – (মাযহারী)

ছহীহ্ মুসলিমে হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে উপস্থিত জনতাকে প্রশ্ন করেছিলেন ঃ কিয়ামতের দিন আমার সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, আমি আল্লাহ্র পয়গাম পৌছিয়েছি কি না। তখন তোমরা উত্তরে কি বলবে? সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ আমরা বলব, আপনি আল্লাহ্র

পয়গাম আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং খোদা প্রদত্ত দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, اللهم اشهد অর্থাৎ, হে আল্লাহ্, আপনি সাক্ষী থাকুন।

মুসনাদ আহমদে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি তাঁর পয়গাম বান্দাদের কাছে পৌঁছিয়েছি কি না। আমি উত্তরে বলব, পৌঁছিয়েছি। কাজেই এখানে তোমরা এ বিষয়ে সচেষ্ট হও যে, যারা এখন উপস্থিত রয়েছে, তারা যেন অনুপস্থিতদের কাছে আমার পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়।— (মাযহারী)

অনুপস্থিতদের অর্থ যারা সেযুগে বর্তমান ছিল; কিন্তু মজলিসে উপস্থিত ছিল না এবং সেসব বংশধর যারা পরবর্তী কালে জন্মগ্রহণ করবে। তাদের কাছে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)– এর পৌঁছানোর অর্থ এই যে, প্রতি যুগের মানুষ তাদের পরবর্তী বংশধরদের কাছে পৌঁছানোর ধারা অব্যাহত রাখবে– যাতে কিয়ামত পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী সব মানুষের কাছে এ পয়গাম পৌঁছে যায়।

এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ ِالْحَقُّ (সেদিন যে ভাল–মন্দ কাজকর্মের ওজন হবে তা সত্য–সঠিকভাবেই হবে)। এতে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এতে মানুষ ধোঁকায় পড়তে পারে যে, যেসব বস্তু ভারী, সেগুলোর ওজন ও পরিমাপ হতে পারে। মানুষের ভাল–মন্দ কাজকর্ম কোন জড় পদার্থ নয় যে, এগুলোকে ওজন করা যেতে পারে। এমতাবস্থায় কাজকর্মের ওজন কিরূপে করা হবে? উত্তর এই যে, প্রথমতঃ পরমপ্রভু আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। তিনি সব কিছুই করতে পারেন। অতএব, আমরা যা ওজন করতে পারি না আল্লাহ্ তাআলাও তা ওজন করতে পারবেন না, এটা জরুরী নয়। দ্বিতীয়তঃ আজকাল জগতে ওজন করার নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে যাতে দাঁড়িপাল্লা, স্কেলকাঁটা ইত্যাদির কোন প্রয়োজন নেই। এসব নবাবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে আজকাল এমন বস্তু ও ওজন করা যায়, যা ইতিপূর্বে ওজন করার কল্পনাও করা যেত না। আজকাল বাতাসের চাপ এবং বৈদ্যুতিক প্রবাহও ওজন করা যায়, এমনকি শীত–গ্রীষ্ম পর্যন্ত ওজন করা হয়। এগুলোর মিটারই এদের দাঁড়িপাল্লা। যদি আল্লাহ তাআলা স্বীয় অসীম শক্তির বলে মানুষের কাজকর্ম ওজন করে নেন, তবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

আমলের ওজন সম্পর্কে একটি সন্দেহ ও তার উত্তর ঃ আমলের ওজন সম্পর্কে হাদীসসমূহের বিশদ বর্ণনায় একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, একাধিক হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী হাশরের দাঁড়িপাল্লায় কলেমা লা–ইলাহা–ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌র ওজন হবে সবচাইতে বেশী। এ কলেমা যে পাল্লায় থাকবে, তা সর্বাধিক ভারী হবে।

তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, ইবনে–হাব্বান, বায়হাকী ও হাকেম প্রমুখ আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ হাশরের ময়দানে আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে তার নিরানব্বইটি আমলনামাসহ সকলের সামনে উপস্থিত করা হবে। প্রত্যেকটি আমলনামা তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত দীর্ঘ হবে। আর সবগুলো আমলনামাই অসৎকাজ এবং গোনাহে পরিপূর্ণ হবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ এসব আমলনামায় যা কিছু লেখা রয়েছে, তার সবই ঠিক, না কি আমলনামা লেখক ফেরেশতা তোমার প্রতি কোন অবিচার করেছে এবং অবাস্তব কোন কথাও লিখে দিয়েছে? সে স্বীকার করে বলবে ঃ আয় পরওয়ারদেগার, এতে যা কিছু লেখা আছে, সবই ঠিক। সে মনে মনে অস্থির হবে যে, এখন মুক্তির উপায় কি? তখন আল্লাহ্ তাআলা বলবেনঃ আজ কারও প্রতি অবিচার হবে না। এসব পাপের মোকাবিলায় তোমার একটি নেকীর পাতাও আমার কাছে আছে। তাতে তোমার কলেমা 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু' লেখা রয়েছে। লোকটি বলবে ঃ ইয়া রব, এত বিরাট পাপপূর্ণ আমলনামার মোকাবেলায় এ ছোট পাতাটির কি মূল্য? তখন আল্লাহ্ বলবেন ঃ তোমার প্রতি অবিচার করা হবে না। অতঃপর এক পাল্লায় পাপে পরিপূর্ণ আমলনামাগুলো রাখা হবে এবং অপর পাল্লায় ঈমানের কলেমা সম্বলিত পাতাটি রাখা হবে এতে কলেমার পাল্লা ভারী হবে এবং পাপের পাল্লা হালকা হবে। এ ঘটনা বর্ণনা করার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ্‌র নামের তুলনায় কোন বস্তুই ভারী হতে পারে না। – (মাযহারী) মুসনাদ, বাযযার ও মুস্তাদরাক হাকেমে উদ্ধৃত হযরত ইবনে ওমরের এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ নূহ (আঃ) – এর ওফাত নিকটবর্তী হলে তিনি তাঁর পুত্রদেরকে সমবেত করে বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে কলেমা লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র ওছিয়ত করছি। কেননা, যদি সাত আসমান ও যমিন এক পাল্লায় এবং কলেমা 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অপর পাল্লায় রাখা হয়, তবে কলেমার পাল্লাই ভারী হবে। এ সম্পর্কিত অনেক হাদীস হযরত আবু সায়ীদ খুদরী, ইবনে আব্বাস ও আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে নির্ভরযোগ্য সনদসহ হাদীস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত রয়েছে। – (মাযহারী)

এসব হাদীস থেকে জানা যায় যে, মুমিনের পাল্লা সব সময়ই ভারী হবে, সে যত পাপই করুক। কিন্তু কোরআনের অন্যান্য আয়াত এবং অনেক হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, মুসলমানের নেকী ও পাপকর্মসমূহেরও ওজন করা হবে। কারও নেকীর পাল্লা ভারী হবে এবং কারও পাপের পাল্লা ভারী হবে। যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সে মুক্তি পাবে এবং যার পাপের পাল্লা ভারী হবে, সে শাস্তি ভোগ করবে।

উদাহরণতঃ কোরআন পাকের এক আয়াতে আছে ঃ

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۚ وَاِنْ
كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ۚ وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ

অর্থাৎ, আমি কিয়ামতের দিন ইনছাফের পাল্লা স্থাপন করব। কাজেই কারও প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার হবে না। যদি একটি রাঈদানা পরিমাণও ভালমন্দ কাজ কেউ করে, তবে সবই সে পাল্লায় রাখা হবে। আমিই হিসাবের জন্যে যথেষ্ট। সূরা কারেয়ায় বলা হয়েছে ঃ

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَاَمَّا
مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ

অর্থাৎ, যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সে সুখ–স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে এবং যার নেকীর পাল্লা হালকা হবে, তার স্থান হবে দোযখে।

এসব আয়াতের তফসীরে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ যে মুমিনের নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সে স্বীয় আমলসহ জান্নাতে এবং যার পাপের পাল্লা ভারী হবে, সে স্বীয় পাপকর্মসহ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। (মাযহারী)

আবু দাউদে আবু হোরায়রা (রাঃ) – এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত

রয়েছে যে, যদি কোন বান্দার ফরয কাজসমূহে কোন ত্রুটি পাওয়া যায়, তবে রাব্বুল আলামীন বলবেন ঃ দেখ, তার নফল কাজও আছে কি না। নফল কাজ থাকলে ফরযের ত্রুটি নফল দ্বারা পূরণ করা হবে।

আমলের ওজন কিভাবে হবে ঃ আবু হোরায়রার (রাঃ) রেওয়ায়েতক্রমে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন কিছু মোটা লোক আসবে। তাদের মূল্য আল্লাহ্র কাছে মশার পাখার সমানও হবে না। এ কথার সমর্থনে তিনি কোরআন পাকের এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ

فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا — অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন আমি তাদের কোন ওজন স্থির করবো না ! – (মাযহার)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) – এর প্রশংসায় বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ তাঁর পা দু'টি বাহ্যতঃ যতই সরু হোক, কিন্তু যার হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম, কিয়ামতের দাঁড়ি-পাল্লায় তাঁর ওজন ওহুদ পর্বতের চাইতেও বেশী হবে।

হযরত আবু হোরায়রার যে হাদীস দ্বারা ইমাম বুখারী স্বীয় গ্রন্থের সমাপ্তি টেনেছেন, তাতে বলা হয়েছে ঃ দু'টি বাক্য উচ্চারণের দিক দিয়ে খুবই হালকা; কিন্তু দাঁড়ি পাল্লায় অত্যন্ত ভারী এবং আল্লাহ্র কাছে অতি প্রিয়। বাক্য দু'টি এই ঃ

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলতেন ঃ 'সোবহাল্লাহ' ! বললে আমলের দাঁড়ি –পাল্লার অর্ধেক ভরে যায় আর আলহামদু লিল্লাহ্ বললে বাকী অর্ধেক পূর্ণ হয়ে যায়।

আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে হাব্বান বিশুদ্ধ সনদে আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ আমলের ওজনের বেলায় কোন আমলই সচ্চরিত্রতার সমান ভারী হবে না।

হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ)-কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছিলেন ঃ তোমাকে দু'টি কাজের কথা বলছি- এগুলো করা মানুষের জন্যে মোটেই কঠিন নয়; কিন্তু ওজনের দিক দিয়ে এগুলো খুবই ভারী হবে। (এক) সচ্চরিত্রতা এবং (দুই) অধিক মৌনতা, অর্থাৎ বিনা প্রয়োজনে কথা না বলা।

ইমাম আহ্মদ কিতাবুয যুহ্দে হযরত হাযেম (রাঃ)–এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেছেন যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর কাছে হযরত জিবরাঈল (আঃ) আগমন করলেন। তখন একব্যক্তি আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদছিলেন। জিবরাঈল বললেন ঃ মানুষের সব আমলেরই ওজন হবে; কিন্তু আল্লাহ্ ও পরকালের ভয়ে কাঁদা এমন একটি আমল, যার কোন ওজন হবে না। বরং এর এক ফোঁটা অশ্রুও জাহান্নামের বৃহত্তম আগুন নির্বাপিত করে দিবে।– (মাযহারী)

এক হাদীসে আছে, হাশরের ময়দানে একটি লোক উপস্থিত হয়ে যখন আমল–নামায় সৎকর্ম কম দেখবে, তখন খুবই অস্থির হয়ে পড়বে। তখন হঠাৎ একটি বস্তু মেঘের মত উঠে আসবে এবং তার আমলনামার পাল্লায় এসে পড়বে। তাকে বলা হবে ঃ দুনিয়াতে তুমি মানুষকে মাসআলা বলতে এবং শিক্ষা দিতে। এ হচ্ছে তোমার সেই আমলের ফল। তোমার এ শিক্ষা এগিয়ে এসেছে এবং যারা এ শিক্ষা অনুযায়ী আমল করেছে, তাদের সবার আমলেও তোমার অংশ রাখা হয়েছে। – (মাযহারী)

তিবরানী ইবনে আব্বাস (রাঃ)–এর বাচনিক বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি জানাযার সাথে কবরস্থান পর্যন্ত যায়, তার আমলের ওজনে দু'টি কিরাত রেখে দেয়া হবে। অন্য এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, এই কিরাতের ওজন হবে ওহুদ পাহাড়ের সমান।

তিবরানী জাবের (রাঃ)–এর বাচনিক বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ মানুষের আমলের দাঁড়ি–পাল্লায় সর্বপ্রথম যে আমল রাখা হবে, তা হবে তার পরিবার–পরিজনের ভরণ–পোষণের ব্যয়রূপী সৎকর্ম।

ইমাম যাহাবী (রহঃ) হযরত এমরান ইবনে হাছীন (রাঃ)–এর বাচনিক বর্ণনা করেছেন, যে কালি দ্বারা দ্বীনী এলেম ও বিধান সংক্রান্ত বিষয় লেখা হয় তা এবং শহীদদের রক্ত কিয়ামতের দিন ওজন করা হবে। তখন ওজনের ক্ষেত্রে আলেমদের কালি শহীদদের রক্তের চাইতেও ভারী হবে।

কিয়ামতে আমলের ওজন সম্পর্কে এ ধরনের বহু হাদীস রয়েছে। এখানে কয়েকটি এজন্যে উল্লেখ করা হলো যে, এগুলো দ্বারা বিশেষ আমলের শ্রেষ্ঠত্ব ও মূল্য অনুমান করা যায়।

মোটকথা, মানুষের যাবতীয় প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র আল্লাহ্ তাআলা ভূ-পৃষ্ঠে সঞ্চিত রেখেছেন। কাজেই সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তাআলার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাই মানুষের কর্তব্য। কিন্তু মানুষ গাফেল হয়ে স্রষ্টার অনুগ্রহরাজি বিস্মৃত হয়ে যায় এবং পার্থিব দ্রব্য–সামগ্রীর মধ্যেই নিজেকে হারিয়ে ফেলে। তাই আয়াতের শেষে অভিযোগের সুরে বলা হয়েছে ঃ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ অর্থাৎ, তোমরা খুব কম লোকই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي
مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿١٢﴾ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ
أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿١٣﴾ قَالَ أَنظِرْنِي
إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿١٥﴾ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي
لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ
وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ
شَاكِرِينَ ﴿١٧﴾ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٨﴾ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ
الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا
مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ
عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ
إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي
لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢١﴾ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا
سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ
أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٢﴾

(১২) আল্লাহ্ বললেন ঃ আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি, তখন তোকে কিসে সেজদা করতে বারণ করল? সে বলল ঃ আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা। (১৩) বললেন তুই এখান থেকে যা। এখানে অহংকার করার কোন অধিকার তোর নাই। অতএব তুই বের হয়ে যা। তুই হীনতমদের অন্তর্ভুক্ত। (১৪) সে বলল ঃ আমাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। (১৫) আল্লাহ্ বললেন ঃ তোকে সময় দেয়া হল। (১৬) সে বলল ঃ আপনি আমাকে যেমন উদ্ভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্য তাদের জন্যে আপনার সরল পথে বসে থাকবো। (১৭) এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বামদিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। (১৮) আল্লাহ্ বললেন ঃ বের হয়ে যা এখান থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে। তাদের যে কেউ তোর পথে চলবে, নিশ্চয় আমি তোদের সবার দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করে দিব। (১৯) হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর। অতঃপর সেখান থেকে যা ইচ্ছা খাও, তবে এ বৃক্ষের কাছে যেয়ো না। তাহলে তোমরা গোনাহ্গার হয়ে যাবে। (২০) অতঃপর শয়তান উভয়কে প্ররোচিত করল, যাতে তাদের অঙ্গ, যা তাদের কাছে গোপন ছিল, তাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়। সে বললঃ তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করেননি; তবে তা এ কারণে যে, তোমরা না আবার ফেরেশতা হয়ে যাও– কিংবা হয়ে যাও চিরকাল বসবাসকারী। (২১) সে তাদের কাছে কসম খেয়ে বলল ঃ আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। (২২) অতঃপর প্রতারণাপূর্বক তাদেরকে সম্মত করে ফেলল। অনন্তর যখন তারা বৃক্ষ আস্বাদন করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে খুলে গেল এবং তারা নিজের উপর বেহেশতের পাতা জড়াতে লাগল। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এখানে উল্লেখিত হযরত আদম (আঃ) ও শয়তানের এ ঘটনা সূরা বাকারার চতুর্থ রুকুতেও বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কিত অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা সেখানে করা হয়েছে। এখানে আরও কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকা সম্পর্কে ইবলীসের দোয়া কবূল হয়েছে কি না? কবূল হয়ে থাকলে দু'টি পরস্পর বিরোধী আয়াতের ভাষায় সামঞ্জস্য বিধান ঃ ইবলীস ঠিক ক্রোধ ও গযবের মুহূর্তে আল্লাহ্ তাআলার কাছে একটি অভিনব প্রার্থনা করে বলেছিল ঃ আমাকে হাশরের দিন পর্যন্ত জীবন দান করুন। আলোচ্য আয়াতে এর উত্তরে শুধু এতটুকুই বলা হয়েছে ঃ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ – অর্থাৎ, তোকে অবকাশ দেয়া হল। দোয়া ও প্রশ্নের ইঙ্গিতে এ থেকে বুঝে নেয়া যায় যে, এ অবকাশ হাশর পর্যন্ত সময়ের জন্যই দেয়া হয়েছে। কারণ, সে এ প্রার্থনাই করেছিল। কিন্তু এ আয়াতে স্পষ্টভাবে একথা বলা হয়নি যে, এখানে উল্লেখিত অবকাশ ইবলীসের আবদার অনুযায়ী হাশর পর্যন্ত দেয়া হয়েছে, না কি অন্য কোন মেয়াদ পর্যন্ত। কিন্তু অন্য আয়াতে এ স্থলে إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ শব্দাবলীও ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে ব্যাহ্যতঃ বোজা যায় যে, ইবলীসের প্রার্থিত অবকাশ কিয়ামত পর্যন্ত দেয়া হয়নি, বরং একটি বিশেষ মেয়াদ পর্যন্ত দেয়া হয়েছে, যা আল্লাহ্র জ্ঞানে সংরক্ষিত। অতএব সারকথা এই যে, ইবলীসের এ দোয়া কবূল হলেও আংশিক কবূল হয়ে থাকবে। অর্থাৎ, কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দানের পরিবর্তে একটি বিশেষ মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হয়েছে।

মোটকথা, শয়তান ঐ সময় পর্যন্ত অবকাশ প্রার্থনা করেছিল যখন দ্বিতীয়বার শিঙ্গা ফুঁক দেয়া পর্যন্ত সব মৃতকে জীবিত করা হবে। একেই পুনরুত্থান দিবস বলা হয়। এ দোয়া হুবহু কবূল হলে যে সময় একমাত্র আল্লাহ্কে ছাড়া অন্য কেউ জীবিত থাকবে না এবং كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ এর বহিঃপ্রকাশ ঘটবে, এ দোয়ার কারণে ইবলীস তখনও জীবিত থাকতো। এ কারণেই তার পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দানের একই দোয়াকে পরিবর্তন করে প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া পর্যন্ত কবূল করা হয়েছে। এর ফলে যেসময় সমগ্র বিশ্ব মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে, তখন ইবলীসও মৃত্যুমুখে পতিত হবে। অতঃপর সবাই যখন পুনরায় জীবিত হবে, তখন সে-ও জীবিত হবে।

কাফেরের দোয়াও কবূল হতে পারে কি ঃ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ এ আয়াত থেকে বাহ্যতঃ বুঝা যায় যে, কাফেরের দোয়া কবূল হয় না; কিন্তু ইবলীসের এ ঘটনাও আলোচ্য আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে উপরোক্ত প্রশ্ন দেখা দেয়। উত্তর এই যে, দুনিয়াতে কাফেরের দোয়াও কবূল হতে পারে। ফলে ইবলীসের মত মহা কাফেরের দোয়াও কবূল হয়ে গেছে। কিন্তু পরকালে কাফেরের দোয়া কবূল হবে না। উল্লিখিত আয়াত وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ পরকালের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দুনিয়ার সাথে এর কোন সম্পর্ক নাই।

আল্লাহ্র সামনে এমন নির্ভীকভাবে কথা বলার দুঃসাহস ইবলীসের কিরূপে হল ঃ রাব্বুল ইযযত আল্লাহ্র মহান দরবারে তাঁর মাহাত্ম্য ও প্রতাপের কারণে রসূল কিংবা ফেরেশতাদেরও নিঃশ্বাস ফেলার

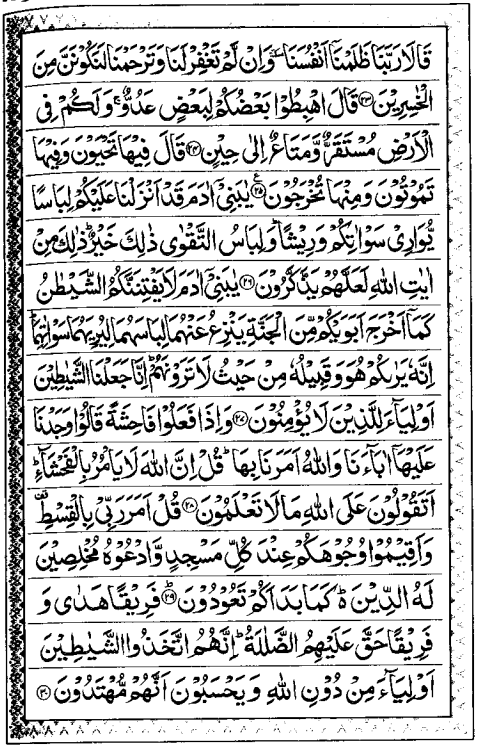

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ
الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾ قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِى
الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٢٤﴾ قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا
تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ﴿٢٥﴾ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا
يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ
اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ
كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا
اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ
اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٧﴾ وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا
عَلَيْهَآ اٰبَآءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ
اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨﴾ قُلْ اَمَرَ رَبِّىْ بِالْقِسْطِ
وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ
لَهُ الدِّيْنَ كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ﴿٢٩﴾ فَرِيْقًا هَدٰى وَ
فَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ
اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٣٠﴾

(২৩) তারা উভয়ে বলল ঃ হে আমাদের পালনকর্তা আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব। (২৪) আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে বাসস্থান আছে এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ফল ভোগ আছে। (২৫) বললেন ঃ তোমরা সেখানেই জীবিত থাকবে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই পুনরুত্থিত হবে। (২৬) হে বনী-আদম! আমি তোমাদের জন্যে পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজ-সজ্জার বস্ত্র এবং পরহেযগারীর পোশাক, এটি সর্বোত্তম। এটি আল্লাহ্র কুদরতের অন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। (২৭) হে বনী-আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে; যেমন সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে এমতাবস্থায় যে, তাদের পোশাক তাদের থেকে খুলিয়ে দিয়েছে- যাতে তাদেরকে লজ্জাস্থান দেখিয়ে দেয়। সে এবং তার দলবল তোমাদেরকে দেখে, যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখ না। আমি শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু করে দিয়েছি, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না। (২৮) তারা যখন কোন মন্দ কাজ করে, তখন বলে ঃ আমরা বাপ-দাদাকে এমনি করতে দেখেছি এবং আল্লাহ্ও আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছেন। আল্লাহ্ মন্দকাজের আদেশ দেন না। এমন কথা আল্লাহ্র প্রতি কেন আরোপ কর, যা তোমরা জান না। (২৯) আপনি বলে দিন ঃ আমার প্রতিপালক সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তোমরা প্রত্যেক সেজদার সময় স্বীয় মুখমণ্ডল সোজা রাখ এবং তাঁকে খাঁটি আনুগত্যশীল হয়ে ডাক। তোমাদেরকে প্রথমে যেমন সৃষ্টি করেছেন, পুনর্বারও সৃজিত হবে। (৩০) একদলকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং একদলের জন্যে পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে শয়তানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং ধারণা করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে।

সাধ্য ছিল না। ইবলীসের এরূপ দুঃসাহস কিরূপে হল? আলেমগণ বলেন ঃ এটাও আল্লাহ্ তাআলার চূড়ান্ত গযবের বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ্র রহমত থেকে বিতাড়িত হওয়ার কারণে ইবলীসের সামনে একটি পর্দা অন্তরায় হয়ে যায়। এ পর্দা তার সামনে আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ও প্রতাপকে ঢেকে দেয় এবং তার মধ্যে নির্লজ্জতা প্রবল করে দেয়। – (বয়ানুল-কোরআন ঃ সংক্ষেপিত)

মানুষের উপর শয়তানের হামলা চতুর্দিকে সীমাবদ্ধ নয়- আরও ব্যাপক ঃ আলোচ্য আয়াতে ইবলীস আদম সন্তানদের উপর আক্রমণ করার জন্যে চারটি দিক বর্ণনা করেছে- অগ্র, পশ্চাৎ, ডান ও বাম। এখানে প্রকৃতপক্ষে কোন সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয়; বরং এর অর্থ হল প্রত্যেক দিক ও প্রত্যেক কোণ থেকে। তাই উপর কিংবা নিচের দিক থেকে পথভ্রষ্ট করার সম্ভাবনা এর পরিপন্থী নয়। এভাবে হাদীসের এ বর্ণনাও এর পরিপন্থী নয় যে, শয়তান মানবদেহে প্রবেশ করে রক্তবাহী রগের মাধ্যমে সমগ্র দেহে হস্তক্ষেপ করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আদম (আঃ) ও ইবলীসের যে ঘটনা আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে, হুবহু এ ঘটনাই সূরা বাকারার চতুর্থ রুকূতে বিশদ বর্ণনাসহ উল্লেখিত হয়েছে। এ সম্পর্কে সম্ভাব্য সব প্রশ্ন ও সন্দেহের বিস্তারিত উত্তর পূর্ণ ব্যাখ্যা ও জ্ঞাতব্য বিষয়াদিসহ সূরা বাকারার তফসীরে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রয়োজন হলে সেখানে দেখে নেয়া যেতে পারে।

ইতিপূর্বে পূর্ণ এক রুকূতে আদম (আঃ) ও অভিশপ্ত শয়তানের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছিল। এতে শয়তানী প্ররোচনার প্রথম পরিণতিতে আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর জান্নাতী পোশাক খুলে গিয়েছিল এবং তাঁরা উলঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। ফলে তাঁরা বৃক্ষপত্র দ্বারা গুপ্তাঙ্গ ঢাকতে শুরু করেছিলেন।

আলোচ্য ২৬ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা সমস্ত আদম সন্তানকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ তোমাদের পোশাক আল্লাহ্ তাআলার একটি মহান নেয়ামত। একে যথার্থ মূল্য দাও। এখানে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়নি-সমগ্র বনী-আদমকে করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদন ও পোশাক মানব জাতির একটি সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই এ নিয়ম পালন করে। অতঃপর এর বিশদ বিবরণে তিন প্রকার পোশাকের উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম, لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ –এখানে يُّوَارِىْ শব্দটি مواراة থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আবৃত করা سوات শব্দটি سوءة এর বহুবচন। এর অর্থ মানুষের ঐসব অঙ্গ, যেগুলো খোলা রাখাকে মানুষ স্বভাবতই খারাপ ও লজ্জাকর মনে করে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তোমাদের মঙ্গলার্থ এমন একটি পোশাক সৃষ্টি করেছি, যদ্দ্বারা তোমরা গুপ্তাঙ্গ আবৃত করতে পার।

এরপর বলা হয়েছে ঃ وَرِيْشًا সাজ-সজ্জার জন্যে মানুষ যে পোশাক পরিধান করে, তাকে ريش বলা হয়। অর্থ এই যে, গুপ্তাঙ্গ আবৃত করার জন্যে তো সংক্ষিপ্ত পোশাকই যথেষ্ট হয়; কিন্তু আমি তোমাদেরকে আরও পোশাক দিয়েছি, যাতে তোমরা তদ্দ্বারা সাজ-সজ্জা করে বাহ্যিক দেহাবয়বকে সুশোভিত করতে পার।

পোশাকের দ্বিবিধ উপকারিতা ঃ আয়াতে পোশাকের দু'টি উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে। (এক) – গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদিত করা এবং (দুই)

শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষা এবং অঙ্গ-সজ্জা। প্রথম উপকারিতাটি অগ্রে বর্ণনা করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা পোশাকের আসল লক্ষ্য। এটাই সাধারণ জন্তু-জানোয়ার থেকে মানুষের স্বাতন্ত্র্য। জন্তু-জানোয়ারের পোশাক সৃষ্টিগতভাবে তাদের দেহের অঙ্গ। এ পোশাকের কাজ শুধু শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষা নয় অঙ্গ-সজ্জাও বটে। গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনেও এর তেমন কোন ভূমিকা নেই। তবে তাদের দেহে গুপ্তাঙ্গ এমনভাবে স্থাপিত হয়েছে, যাতে সম্পূর্ণ খোলা না থাকে। কোথাও লেজ দ্বারা আবৃত করা হয়েছে এবং কোথাও অন্যভাবে।

আদম, হাওয়া এবং তাঁদের সাথে শয়তানী প্ররোচনার ঘটনা বর্ণনা করার পর পোশাকের কথা উল্লেখ করায় এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, উলঙ্গ হওয়া এবং গুপ্তাঙ্গ অপরের সামনে খোলা চূড়ান্ত হীনতা ও নির্লজ্জতার লক্ষণ এবং নানা প্রকার অনিষ্টের ভূমিকা বিশেষ।

মানুষের উপর শয়তানের প্রথম হামলা ঃ মানুষের বিরুদ্ধে শয়তানের সর্বপ্রথম আক্রমণের ফলে তার পোশাক খসে পড়েছিল। আজও শয়তান তার শিষ্যবর্গের মাধ্যমে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছায় সভ্যতার নামে সর্বপ্রথম তাকে উলঙ্গ বা অর্ধ-উলঙ্গ করে পথে নামিয়ে দেয়। শয়তানের তথাকথিত প্রগতি নারীকে লজ্জা-শরম থেকে বঞ্চিত করে সাধারণ্যে অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় নিয়ে আসা ছাড়া অর্জিতই হয় না।

ঈমানের পর সর্বপ্রথম ফরয গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা ঃ শয়তান মানুষের এ দুর্বলতা আঁচ করে সর্বপ্রথম হামলা গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনের উপর করেছে। তাই মানুষের সর্বপ্রকার মঙ্গল বিধানকারী শরীয়ত গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনের প্রতি এতটুকু গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, ঈমানের পর সর্বপ্রথম ফরয গুপ্তাঙ্গ আবৃত করাকেই স্থির করেছে। নামায, রোযা ইত্যাদি সবই এরপর।

হযরত ফারূকে আযম (রাঃ) বলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ নতুন পোশাক পরিধান করার সময় এ দোয়া পাঠ করা উচিত ঃ ''সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাকে পোশাক দিয়েছেন। এ পোশাক দ্বারা আমি গুপ্ত-অঙ্গ আবৃত করি এবং সাজ-সজ্জা করি।''

নতুন পোশাক তৈরীর সময় পুরাতন পোশাক দান করে দেয়ার ছওয়াব ঃ তিনি আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি নতুন পোশাক পরার পর পুরাতন পোশাক ফকীর-মিসকীনকে দান করে দেয়, সে জীবনে ও মরণে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে চলে আসে। - (ইবনে-কাসীর)

এ হাদীসেও মানুষকে পোশাক পরিধানের সময় ঐ দু'টি উপকারিতাই স্মরণ করানো হয়েছে, যার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা পোশাক সৃষ্টি করেছেন।

পোশাকের তৃতীয় প্রকার ঃ গুপ্ত-অঙ্গ আবৃতকরণ এবং আরাম ও সাজ-সজ্জার জন্যে দু'প্রকার পোশাক বর্ণনা করার পর কোরআন পাক তৃতীয় এক প্রকার পোশাকের কথা উল্লেখ করে বলেছে ঃ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ কোন কোন কেরাআতে যবর দিয়ে لِبَاسَ التَّقْوٰى পড়া হয়েছে। এমতাবস্থায় انزلنا এর مفعول হয়ে অর্থ হবে এই যে, আমি একটি তৃতীয় পোশাক অর্থাৎ, তাকওয়ার পোশাক অবতীর্ণ করেছি। প্রসিদ্ধ কেরাআত অনুযায়ী অর্থ এই যে, এ দু'প্রকার পোশাক তো সবাই জানে। তৃতীয় একটি পোশাক হচ্ছে তাকওয়ার পোশাক। এটি সর্বোত্তম পোশাক। হযরত ইবনে আব্বাস ও ওরওয়া ইবনে যুবায়র (রাঃ)-এর তফসীর অনুযায়ী তাকওয়ার পোশাক বলে সৎকর্ম ও খোদাভীতিকে বোঝানো হয়েছে। - (রুহুল-মা'আনী)

উদ্দেশ্য এই যে, বাহ্যিক পোশাক যেমন মানুষের গুপ্ত অঙ্গের জন্যে আবরণ এবং শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষা ও সাজ-সজ্জার উপায় হয়, তেমনি সৎকর্ম ও খোদাভীতিও একটি আধ্যাত্মিক পোশাক। এটি মানুষের চারিত্রিক দোষ ও দুর্বলতার আবরণ এবং স্থায়ী কষ্ট ও বিপদাপদ থেকে মুক্তিলাভের উপায়। এ কারণেই এটি সর্বোত্তম পোশাক।

বাহ্যিক পোশাকের আসল উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন করা ঃ لِبَاسُ التَّقْوٰى শব্দ থেকে এদিকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বাহ্যিক পোশাক দ্বারা গুপ্ত-অঙ্গ আবৃত করা ও সাজ-সজ্জা করার আসল উদ্দেশ্য তাকওয়া ও খোদাভীতি। এ খোদাভীতি পোশাকের মধ্যেও এভাবে প্রকাশ পাওয়া উচিত যেন গুপ্তাঙ্গসমূহ পুরোপুরি আবৃত হয়। পোশাক শরীরে এমন আঁটসাটও না হওয়া চাই, যাতে এসব অঙ্গ উলঙ্গের মত দৃষ্টিগোচর হয়। পোশাকে অহঙ্কার ও গর্বের ভঙ্গিও না থাকা চাই; বরং নম্রতার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হওয়া চাই। প্রয়োজনাতিরিক্ত অপব্যয় না হওয়া চাই, মহিলাদের জন্যে পুরুষদের এবং পুরুষদের জন্যে মহিলাদের পোশাক না হওয়া চাই, যা আল্লাহ্ তাআলার অপছন্দনীয়। অধিকন্তু পোশাকে বিজাতির অনুকরণও না হওয়া চাই, যা স্বজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পরিচায়ক।

এতদসঙ্গে পোশাকের আসল উদ্দেশ্য চরিত্র ও কর্মের সংশোধনও হওয়া চাই। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ অর্থাৎ, মানুষকে এ তিন প্রকার পোশাক দান করা আল্লাহ্ তাআলার শক্তির নিদর্শনসমূহের অন্যতম— যাতে মানুষ এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় আয়াতে পুনরায় সব মানব সন্তানকে সম্বোধন করে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, প্রত্যেক কাজে শয়তান থেকে বেঁচে থাক। সে যেন আবার তোমাদেরকে ফাসাদে ফেলে না দেয়; যেমন তোমাদের পিতা-মাতা আদম ও হাওয়াকে জান্নাত থেকে বের করিয়েছে এবং তাদের পোশাক খুলে উলঙ্গ করার কারণ হয়েছে। সে তোমাদের পুরাতন শত্রু। সর্বদা তার শত্রুতার প্রতি লক্ষ্য রাখ।

ইসলামের পূর্বে জাহেলিয়াত যুগে শয়তান মানুষকে যেসব লজ্জাজনক ও অর্থহীন কুপ্রথায় লিপ্ত করেছিল, তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, কোরাইশদের ছাড়া কোন ব্যক্তি নিজ বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় কা'বা গৃহের তওয়াফ করতে পারত না। তাকে হয় কোন কোরাইশীর কাছ থেকে বস্ত্র ধার করতে হতো, না হয় উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করতে হতো।

এটা জানা কথা যে, আরবের সব মানুষকে বস্ত্র দেয়া কোরাইশদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাই পুরুষ মহিলা অধিকাংশ লোক উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করত। মহিলারা সাধারণতঃ রাতের অন্ধকারে তওয়াফ করত। তারা এ শয়তানী কাজের কারণ এই বর্ণনা করত যে, যেসব পোশাক পরে আমরা পাপকাজ করি, সেগুলো পরিধান করে আল্লাহ্‌র ঘর প্রদক্ষিণ করা বেআদবী। এ জ্ঞানপাপীরা এ বিষয়টি বুঝত না যে, উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করা আরও বেশী বেআদবীর কাজ। হরমের সেবক হওয়ার সুবাদে শুধু কোরাইশ গোত্র এ উলঙ্গতা আইনের ব্যতিক্রম ছিল।

আলোচ্য প্রথম আয়াত এ নির্লজ্জ প্রথা ও তার অনিষ্ট বর্ণনা করার জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে ঃ তারা যখন কোন অশ্লীল কাজ করত, তখন কেউ নিষেধ করলে তারা উত্তরে বলত ঃ আমাদের বাপ-দাদা

ও মুরুব্বিরা তাই করে এসেছেন। তাদের তরিকা ত্যাগ করা লজ্জার কথা। তারা আরও বলত আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছেন।

অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আয়াতে অশ্লীল কাজ বলে উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফকেই বোঝানো হয়েছে। فحشاء، فحش ও فاحشة এমন প্রত্যেক মন্দ কাজকে বলা হয়, যা চূড়ান্ত পর্যায়ের মন্দ এবং যুক্তি, বুদ্ধি ও সুস্থ বিবেকের কাছে পূর্ণমাত্রায় সুস্পষ্ট। – (মাযহারী)

এস্তরে ভাল ও মন্দের যুক্তিগত ব্যাপার হওয়া সবার কাছে স্বীকৃত। – (রুহুল-মা'আনী)

তারা এ বাজে প্রথার বৈধতা প্রতিপন্ন করার জন্যে দু'টি প্রমাণ উপস্থিত করেছে। (এক) বাপ-দাদার অনুসরণ; অর্থাৎ, বাপ-দাদার তরিকা কায়েম রাখার মধ্যেই মঙ্গল নিহিত। এর উত্তর দিবালোকের মত সুস্পষ্ট। মূর্খ বাপ-দাদার অনুসরণ করার মধ্যে কোন যৌক্তিকতা নেই। সামান্য জ্ঞান ও চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিও একথা বুঝতে পারে যে, কোন তরিকার বৈধতার পক্ষে এটা কোন প্রমাণ হতে পারে না যে, বাপ-দাদা এরূপ করত। কেননা, বাপ-দাদার তরিকা হওয়া যদি কোন তরিকার বিশুদ্ধতার জন্যে যথেষ্ট হয়, তবে দুনিয়াতে বিভিন্ন লোকের বাপ-দাদার বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী তরিকা ছিল। এ যুক্তির ফলে জগতের সব ভ্রান্ত তরিকাও বৈধ ও বিশুদ্ধ প্রমাণিত হয়ে যায়। মোটকথা, মূর্খদের এ প্রমাণ ভ্রুক্ষেপযোগ্য ছিল না বলেই কোরআন পাক এখানে এর উত্তর দেয়া জরুরী মনে করেনি। তবে অন্যান্য আয়াতে এরও উত্তর দিয়ে বলা হয়েছে যে, বাপ-দাদারা কোন মূর্খতাসুলভ কাজ করলেও কি তা অনুসরণযোগ্য হতে পারে?

উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করার বৈধতার প্রশ্নে তাদের দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, আল্লাহ্ তাআলাই আমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন। এটা সর্বৈব মিথ্যা এবং আল্লাহ্ তাআলার প্রতি ভ্রান্তি আরোপ। এর উত্তরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ অর্থাৎ, আপনি বলে দিন ঃ আল্লাহ্ তাআলা কখনও অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না। কেননা, এরূপ নির্দেশ দেয়া খোদায়ী প্রজ্ঞা ও শানের পরিপন্থী। অতঃপর তাদের এ মিথ্যা অপবাদ ও ভ্রান্ত ধারণা পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্যে তাদেরকে হুশিয়ার করে বলা হয়েছে ঃ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ অর্থাৎ, তোমরা কি আল্লাহ্র প্রতি এমন বিষয় আরোপ কর, যার জ্ঞান তোমাদের কাছে নেই? জানা কথা যে, না জেনে না শুনে কোন ব্যক্তির প্রতি কারো সম্বন্ধ করে দেয়া চরম ধৃষ্টতা ও অন্যায়। অতএব, আল্লাহ্র প্রতি এমন ভ্রান্ত সম্বন্ধ করা কত বড় অপরাধ ও অন্যায় হবে! মুজতাহিদগণ কোরআনের আয়াত থেকে ইজতিহাদের মাধ্যমে যেসব বিধান উদ্ভাবন করেন, সেগুলো এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, তাঁরা প্রমাণের ভিত্তিতে এসব বিধান উদ্ভাবন করেন।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ অর্থাৎ, যেসব মূর্খ উলঙ্গ তওয়াফ বৈধ করার ভ্রান্ত সম্বন্ধ আল্লাহ্র দিকে করে, আপনি তাদের বলে দিন ঃ আল্লাহ্ তাআলা সর্বদা قسط এর নির্দেশ দেন। قسط এর আসল অর্থ ন্যায়বিচার ও সমতা। এখানে ঐ কাজকে বোঝানো হয়েছে, যাতে কোনরূপ ত্রুটিও নেই এবং নির্দিষ্ট সীমার লঙ্ঘনও নেই। অর্থাৎ, স্বল্পতা ও বাহুল্য থেকে মুক্ত। শরীয়তের সব বিধি-বিধানের অবস্থা তাই। এজন্যে قسط শব্দের অর্থে যাবতীয় এবাদত, আনুগত্য ও শরীয়তের সাধারণ বিধি-বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। – (রুহুল-মা'আনী)

এ আয়াতে ন্যায়বিচার ও সমতার নির্দেশ বর্ণনা করার পর তাদের পথভ্রষ্টতার উপযোগী দু'টি বিধান বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এক, وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ এবং দুই, وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ প্রথম বিধানটি মানুষের বাহ্যিক কাজকর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে প্রথম বিধানে শব্দটি সেজদা ও এবাদতের অর্থে বর্ণিত হয়েছে। অর্থ এই যে, প্রত্যেক এবাদত ও নামাযের সময় স্বীয় মুখমণ্ডল সোজা রাখা। এর এক উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে, নামাযের সময় মুখমণ্ডল সোজা কেবলার দিকে রাখতে যত্নবান হও এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এ-ও হতে পারে যে, প্রত্যেক কথায়, কাজে এবং কর্মে স্বীয় আননকে প্রতিপালকের নির্দেশের অনুসারী রাখ এবং সতর্ক থাক যে, এদিক-সেদিক যেন না হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে এ বিধানটি বিশেষভাবে নামাযের জন্যে হবে না; বরং যাবতীয় এবাদত ও লেন-দেনকেও পরিব্যাপ্ত করবে।

দ্বিতীয় বিধানের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলাকে এমনভাবে ডাক, যেন এবাদত খাঁটিভাবে তাঁরই হয়; এতে যেন অন্য কারও অংশীদারিত্ব না থাকে; এমন কি, গোপন শিরক অর্থাৎ, লোক-দেখানো ও নাম-যশের উদ্দেশ্য থেকেও পবিত্র হওয়া চাই।

এ বিধান দু'টি পাশাপাশি উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় অবস্থাকে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী সংশোধন করা অবশ্য কর্তব্য। আন্তরিকতা ব্যতীত শুধু বাহ্যিক আনুগত্য যথেষ্ট নয়। এমনিভাবে শুধু আন্তরিকতা বাহ্যিক শরীয়তের অনুসরণ ব্যতীত যথেষ্ট হতে পারে না। বরং বাহ্যিক অবস্থাকেও শরীয়ত অনুযায়ী সংশোধন করা এবং অন্তরকেও আল্লাহ্র জন্যে খাঁটি রাখা একান্ত জরুরী। এতে তাদের ভ্রান্তি ফুটে উঠেছে, যারা শরীয়ত ও তরীকতকে ভিন্ন ভিন্ন পন্থা মনে করে। তাদের ধারণা এই যে, তরীকত অনুযায়ী অন্তর সংশোধন করে দেয়াই যথেষ্ট, তাতে শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ হলেও কোন দোষ নেই। বলাবাহুল্য এটা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতা।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা যেভাবে তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনিভাবে কেয়ামতের দিন পুনর্বার তোমাদেরকে সৃষ্টি করে দণ্ডায়মান করবেন। তাঁর অসীম শক্তির পক্ষে এটা কোন কঠিন কাজ নয়; বরং খুব সহজ। সম্ভবতঃ এ সহজ হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করার জন্যে يعيدكم এর পরিবর্তে تَعُودُونَ বলেছেন। অর্থাৎ, পুনর্বার সৃষ্টি করার জন্যে বিশেষ কোন কর্মতৎপরতা ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই। – (রুহুল-মা'আনী)

এ বাক্যটি এখানে আনার আরও একটি উপকারিতা এই যে, এর ফলে শরীয়তের বিধানাবলীতে পূর্ণরূপে কায়েম থাকা মানুষের জন্যে সহজ হয়ে যাবে। কেননা, পরকাল ও কেয়ামত এবং তথায় ভালমন্দ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তির কল্পনাই মানুষের জন্যে প্রত্যেক কঠিনকে সহজ এবং কষ্টকে সুখে রূপান্তরিত করতে পারে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, মানুষের মধ্যে এ ভীতি জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত কোন ওয়াজ ও উপদেশ তাকে সোজা করতে পারে না এবং কোন আইনই তাকে অপরাধ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে না।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ একদল লোককে তো আল্লাহ্ তাআলা হেদায়েত দান করেছেন এবং একদলের জন্যে পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। কেননা, তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে শয়তানদেরকে সহচর করেছে;

অথচ তাদের ধারণা এই যে, তারা সঠিক পথে রয়েছে।

উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌র হেদায়েত যদিও সবার জন্যে ছিল কিন্তু তারা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে শয়তানদের অনুসরণ করেছে এবং জুলুমের উপর জুলুম এই হয়েছে যে, তারা স্বীয় অসুস্থাবস্থাকেই সুস্থতা এবং পথভ্রষ্টতাকেই হেদায়েত মনে করে নিয়েছে।

এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে মূর্খতা ও অজ্ঞতা কোন ওযর নয়। যদি কেউ ভ্রান্ত পথকে বিশুদ্ধ মনে করে পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে তা অবলম্বন করে, তবে সে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমাযোগ্য নয়। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেককে চেতনা, ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞান ও বুদ্ধি এ জন্যেই দিয়েছেন, যাতে সে তদ্দ্বারা আসল ও মেকী এবং অশুদ্ধ ও শুদ্ধকে চিনে নেয়। অতঃপর তাকে এ জ্ঞানবুদ্ধির উপরই ছেড়ে দেননি, পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন এবং গ্রন্থ নাযিল করেছেন। এসবের মাধ্যমে শুদ্ধ ও ভ্রান্ত এবং সত্য ও মিথ্যাকে পুরোপুরিভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

যদি কারও মনে সন্দেহ জাগে যে, যে ব্যক্তি বাস্তবে নিজেকে সত্য মনে করে যদিও সে ভ্রান্ত হয়, তাতে তার দোষ কি? সে ক্ষমার্হ হওয়া উচিত। কারণ, সে নিজের ভ্রান্তি সম্পর্কে জ্ঞাতই ছিল না। উত্তর এই যে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষকে জ্ঞান, বিবেচনা অতঃপর পয়গম্বরদের শিক্ষা দান করেছেন। এগুলোর মাধ্যমে কমপক্ষে তার অবলম্বিত পথের বিপরীতটির সম্ভাবনা ও সন্দেহ অবশ্যই হওয়া উচিত। এখন তার দোষ এই যে, সে এসব সম্ভাবনা ও সন্দেহের প্রতি ভ্রূক্ষেপই করেনি এবং যে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছে তাতেই অটল রয়েছে।

অবশ্য যে ব্যক্তি সত্যান্বেষণে যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও বিশুদ্ধ পথ ও সত্যের সন্ধান লাভে ব্যর্থ হয়, আল্লাহ্ তাআলার কাছে তার ক্ষমার্হ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইমাম গাযালী (রহঃ) 'আত্তাফরেকাতু বাইনাল ইসলামে ওয়াযিনিদকাহ্' গ্রন্থ একথা বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ হে আদম সন্তানেরা! তোমরা মসজিদে প্রত্যেক উপস্থিতির সময় স্বীয় পোশাক পরিধান করে নাও এবং তৃপ্তির সাথে খাও ও পান কর-সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা সীমা লংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। জাহেলিয়াত যুগে আরবরা উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা গৃহের তওয়াফকে যেমন বিশুদ্ধ এবাদত এবং কা'বা গৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন মনে করত, তেমনি তারা হজ্বের দিনগুলোতে পানাহার ত্যাগ করত। এতটুকু পানাহার করত, যাতে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু থাকতে পারে। বিশেষতঃ ঘি, দুধ ও অন্যান্য সুস্বাদু খাদ্য সম্পূর্ণরূপে বর্জন করত।- (ইবনে-জরীর)

তাদের এ অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করা নির্লজ্জতা ও বে-আদবী বিধায় বর্জনীয়। এমনিভাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত সুস্বাদু খাদ্য অহেতুক বর্জন করাও কোন ধর্মকাজ নয়; বরং তাঁর হালালকৃত বস্তুসমূহকে হারাম করে নেয়া ধৃষ্টতা এবং এবাদতে সীমালঙ্ঘন। আল্লাহ্ তাআলা একে পছন্দ করেন না। তাই হজ্বের দিনগুলোতে তৃপ্তির সাথে খাও, পান কর; তবে অপব্যয় করো না। হালাল খাদ্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, হজ্বের আসল লক্ষ্য এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে পানাহারে মশগুল থাকাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

এ আয়াতটি যদিও জাহেলিয়াত যুগের আরবদের একটি বিশেষ কুপ্রথা উলঙ্গতাকে মিটানোর জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে, যা তারা তওয়াফের সময় আল্লাহর গৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নামে করত, কিন্তু তফসীরবিদ ও ফেকাহবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোন বিশেষ ঘটনায় কোন নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ এরূপ নয় যে,নির্দেশটি এ ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। বরং ভাষার ব্যাপকতা দেখতে হবে। যে যে বিষয় ভাষার ব্যাপকতার আওতায় পড়ে, সবগুলোর ক্ষেত্রে সে নির্দেশ প্রযোজ্য হবে।

নামাযে গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করা ফরয ঃ তাই ছাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামগণ এ আয়াত থেকে বেশ কয়েকটি বিধান উদ্ভাবন করেছেন। প্রথম— উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করা যেমন নিষিদ্ধ হয়েছে, তেমনি উলঙ্গ অবস্থায় নামায পড়াও হারাম ও বাতিল। কারণ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ الطواف بالبيت صلوٰة (বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফও এক প্রকার নামায) এছাড়া স্বয়ং এ আয়াতেই তফসীর বিদগণের মতে যখন مسجد বলে সেজদা বোঝানো হয়েছে, তখন সেজদা অবস্থায় উলঙ্গতার নিষেধাজ্ঞা আয়াতে স্পষ্টভাবেই বর্ণিত হয়ে যায়। সেজদায় যখন নিষিদ্ধ হল, তখন নামাযের যাবতীয় ক্রিয়াকর্মেও অপরিহার্যরূপে নিষিদ্ধ হবে।

অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উক্তি বিষয়টিকে আরও ফুটিয়ে তুলেছে। এক হাদীসে তিনি বলেন ঃ চাদর পরিধান ব্যতীত কোন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার নামায জায়েয নয়।- (তিরমিযী)

নামায ছাড়া অন্যান্য অবস্থায়ও গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করা যে ফরয, তা অন্যান্য আয়াত ও রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত আছে। তন্মধ্যে এ সূরারই একটি আয়াত পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে ঃ

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ

মোটকথা, এই যে, গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা মানুষের জন্যে প্রথম মানবিক ও ইসলামী ফরয। এটা সর্বাবস্থায় অপরিহার্য। নামায ও তওয়াফে আরও উত্তমরূপে ফরয।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا
تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ
اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ
يَّعْلَمُوْنَ ﴿٣٢﴾ قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَ
الْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا
وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ
اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣٤﴾ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا
يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ ۙ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا
وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣٦﴾ فَمَنْ
اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ۗ اُولٰٓئِكَ
يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ۗ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا
يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ قَالُوْٓا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ
قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿٣٧﴾

(৩১) হে বনী-আদম! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সাজসজ্জা পরিধান করে নাও- খাও ও পান কর এবং অপব্যয় করো না। তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না। (৩২) আপনি বলুনঃ আল্লাহ্‌র সাজ-সজ্জাকে- যা তিনি বান্দাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্যবস্তুসমূহকে কে হারাম করেছে? আপনি বলুন ঃ এসব নেয়ামত আসলে পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্যে এবং কিয়ামতের দিন খাঁটিভাবে তাদেরই জন্যে। এমনিভাবে আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি তাদের জন্যে, যারা বুঝে। (৩৩) আপনি বলে দিন ঃ আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন- যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গোনাহ্, অন্যায়-অত্যাচার, আল্লাহ্‌র সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোন, সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহ্‌র প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জান না। (৩৪) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটি মেয়াদ রয়েছে। যখন তাদের মেয়াদ এসে যাবে, তখন তারা না এক মুহূর্ত পিছে যেতে পারবে, আর না এগিয়ে আসতে পারবে। (৩৫) হে বনী-আদম, যদি তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে পয়গম্বর আগমন করে - তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ শুনায়, তবে যে ব্যক্তি সংযত হয় এবং সৎকাজ অবলম্বন করে, তাদের কোন আশঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। (৩৬) যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলবে এবং তা থেকে অহংকার করবে, তারাই দোযখী এবং তথায় চিরকাল থাকবে। (৩৭) অতঃপর ঐ ব্যক্তির চাইতে অধিক জালেম কে, যে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁর নির্দেশাবলীকে মিথ্যা বলে? তারা তাদের গ্রন্থে লিখিত অংশ পেয়ে যাবে। এমন কি, যখন তাদের কাছে আমার প্রেরিত ফেরেশতারা প্রাণ নেওয়ার জন্যে পৌঁছে, তখন তারা বলে ঃ তারা কোথায় গেল, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আহবান করতে? তারা উত্তর দেবে ঃ আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে, তারা নিজেদের সম্পর্কে স্বীকার করবে যে, তারা অবশ্যই কাফের ছিল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

নামাযের জন্যে উত্তম পোশাক ঃ আয়াতের দ্বিতীয় মাসআলা, পোশাককে زينت (সাজ-সজ্জা) শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নামাযে শুধু গুপ্ত-অঙ্গ আবৃত করা ছাড়াও সামর্থ্য অনুযায়ী সাজ-সজ্জার পোশাক পরিধান করা শ্রেয়ঃ। হযরত হাসান (রাঃ) নামাযের সময় উত্তম পোশাক পরিধানে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি বলতেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা সৌন্দর্য পছন্দ করেন, তাই আমি প্রতিপালকের সামনে সুন্দর পোশাক পরে হাজির হই। তিনি বলেছেন ঃ

خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

বোঝা গেল, এ আয়াত দ্বারা যেমন নামাযে গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করা ফরয বলে প্রমাণিত হয়, তেমনি সামর্থ্য অনুযায়ী পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করার ফযীলতও প্রমাণিত হয়।

নামাযে পোশাক সম্পর্কে কয়েকটি মাসআলা ঃ আয়াতের তৃতীয় মাসআলা, যে গুপ্ত-অঙ্গ সর্বাবস্থায় বিশেষতঃ নামায ও তওয়াফে আবৃত করা ফরয, তার সীমা কি? কোরআন পাক সংক্ষেপে গুপ্ত-অঙ্গ আবৃত করার নির্দেশ দিয়ে এর বিবরণ দানের দায়িত্ব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উপর ন্যস্ত করেছে। তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন যে, পুরুষের গুপ্তাঙ্গ নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের গুপ্তাঙ্গ মুখমণ্ডল, হাতের তালু এবং পদযুগল বাদে সমস্ত দেহ।

হাদীসসমূহে এসব বিবরণ বর্ণিত রয়েছে। নাভীর নীচের অংশ অথবা হাঁটু খোলা থাকলে পুরুষের জন্যে এরূপ পোশাক এমনিতেও গর্হিত এবং এতে নামাযও আদায় হয় না। এমনিভাবে নারীর মস্তক, ঘাড় অথবা বাহু অথবা পায়ের গোছা খোলা থাকলে এরূপ পোশাক এমনিতে নাজায়েয এবং এতে নামাযও আদায় হয় না। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ যে গৃহে নারী খোলা মাথায় থাকে, সে গৃহে নেকীর ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

নারীর মুখমণ্ডল, হাতের তালু এবং পদযুগল গুপ্তাঙ্গের বাইরে রাখা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, নামাযে এসব অঙ্গ খোলা থাকলে নামাযে কোন ত্রুটি হবে না। এর অর্থ এরূপ কখনও নয় যে, মাহ্‌রাম নয়, এরূপ ব্যক্তির সামনেও সে শরীয়ত সম্মত ওযর ব্যতীত মুখমণ্ডল খুলে ঘুরাফেরা করবে।

এ হচ্ছে গুপ্তাঙ্গের ফরয সম্পর্কিত বিধান। এটি ছাড়া নামাযই হয় না। নামাযে শুধু গুপ্তাঙ্গ আবৃত করাই কাম্য নয়; বরং সাজ-সজ্জার পোশাক পরিধান করতেও বলা হয়েছে। তাই পুরুষের উলঙ্গ মাথায় নামায পড়া কিংবা কনুই খুলে নামায পড়া মাকরূহ। হাফশার্ট পরিহিত অবস্থায় হোক কিংবা আস্তিন গুটানো হোক— সর্বাবস্থায় মাকরূহ। এমনিভাবে এমন পোশাক পরে নামায পড়া মাকরূহ, যা পরিধান করে বন্ধু-বান্ধব কিংবা সাধারণ লোকের সামনে যাওয়া লজ্জাজনক মনে করা হয়; যেমন কোর্তা ছাড়া শুধু গেঞ্জি গায়ে নামায পড়া যদিও আস্তিন পূর্ণ হয় কিংবা টুপির পরিবর্তে মাথায় কোন কাপড় অথবা ছোট হাত-রুমাল বেঁধে নামায পড়া। কারণ, রুচি সম্মত ব্যক্তি মাত্রই এ অবস্থায় বন্ধু-বান্ধব অথবা অপরের সামনে যাওয়া পছন্দ করে না। এমতাবস্থায় বিশ্ব পালনকর্তা আল্লাহর দরবারে যাওয়া কিরূপে পছন্দনীয় হতে পারে? মাথা, কাঁধ, কনুই ইত্যাদি খুলে নামায পড়া যে মাকরূহ তা আয়াতে ব্যবহৃত زينت (সাজ-সজ্জা) শব্দ থেকে এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বক্তব্য থেকেও বোঝা যায়।

আয়াতের প্রথম বাক্য যেমন মূর্খতা যুগের আরবদের উলঙ্গতা মিটানোর জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে কিন্তু ভাষার ব্যাপকতাদৃষ্টে তা থেকে

অনেক বিধান ও মাসআলাও জানা গেছে। এমনিভাবে দ্বিতীয় وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا বাক্যটিও আরবদের হজ্বের দিনগুলোতে উৎকৃষ্ট পানাহারকে গোনাহ্ মনে করার কুপ্রথা মিটানোর জন্যে অবতীর্ণ হলেও ভাষার ব্যাপকতাদৃষ্টে এখানেও অনেক বিধান ও মাসআলা প্রমাণিত হয়।

যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু পানাহার ফরয ঃ প্রথম, শরীয়তের দিক দিয়েও পানাহার করা মানুষের জন্য ফরয ও জরুরী। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ পানাহার বর্জন করে, ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয় কিংবা এমন দুর্বল হয়ে পড়ে যে, ফরয কর্মও সম্পাদন করতে অক্ষম হয়, তবে সে আল্লাহ্র কাছে অপরাধী ও পাপী হবে।

নিষিদ্ধতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোন কিছু অবৈধ হয় না ঃ আহকামুল কোরআন জাস্সাসের বর্ণনামতে এ আয়াত থেকে একটি মাসআলা এরূপ বোঝা যায় যে, জগতে পানাহারের যত বস্তু রয়েছে আসলের দিক দিয়ে সেগুলো সব হালাল ও বৈধ। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বিশেষ বস্তুর অবৈধতা ও নিষিদ্ধতা শরীয়তের কোন প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত না হয়, ততক্ষণ প্রত্যেক বস্তুকে হালাল ও বৈধ মনে করা হবে। وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا বাক্যে **مفعول** অর্থাৎ, কি বস্তু পানাহার করবে, তা উল্লেখ না করায় এ মাসআলার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আরবী ভাষায় বিশেষজ্ঞগণ বলেন ঃ এরূপ স্থলে **مفعول** উল্লেখ না করে **مفعول** এর ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয় অর্থাৎ, প্রত্যেক বস্তু পানাহার করতে পার – ঐ সব দ্রব্য-সামগ্রী বাদে, যেগুলো স্পষ্টভাবে হারাম করা হয়েছে।

পানাহারে সীমালংঘন বৈধ নয় ঃ আয়াতের শেষ বাক্য وَلَا تُسْرِفُوْا দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পানাহারের অনুমতি বরং নির্দেশ থাকার সাথে সাথে অপব্যয় করার নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে। আয়াতে ব্যবহৃত **اسراف** শব্দের অর্থ সীমালঙ্ঘন করা। সীমালঙ্ঘন কয়েক প্রকারের হতে পারে। এক, হালালকে অতিক্রম করে হারাম পর্যন্ত পৌঁছা এবং হারাম বস্তু পানাহার করতে থাকা। এ সীমালঙ্ঘন যে হারাম তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়।

দুই, আল্লাহ্র হালালকৃত বস্তুসমূহকে শরীয়ত সম্মত কারণ ছাড়াই হারাম মনে করে বর্জন করা। হারাম বস্তু ব্যবহার করা যেমন অপরাধ ও গোনাহ্ তেমনি হালালকে হারাম মনে করাও খোদায়ী আইনের বিরোধিতা ও কঠোর গোনাহ্- (ইবনে-কাসীর, মাযহারী, রুহুল-মাআনী)

ক্ষুধা ও প্রয়োজনের চাইতে অধিক পানাহার করাও সীমালঙ্ঘনের মধ্যে গণ্য। তাই ফেকাহ্বিদগণ উদর পূর্তির অধিক ভক্ষণ করাকে না-জায়েয লিখেছেন। (আহকামুল-কোরআন) এমনিভাবে শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কম খেয়ে দুর্বল হয়ে পড়া, ফলে ফরয কর্ম সম্পাদনের শক্তি না থাকা- এটাও সীমালঙ্ঘনের মধ্যে গণ্য। উল্লেখিত উভয় প্রকার অপব্যয় নিষিদ্ধ করার জন্যে কোরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا إِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ

অর্থাৎ, অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ إِذَآ أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাদেরকে পছন্দ করেন, যারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যবর্তিতা অবলম্বণ করে- প্রয়োজনের চাইতে বেশী ব্যয় করে না এবং কমও করে না।

পানাহারে মধ্য পন্থাই দ্বীন ও দুনিয়ার জন্যে উপকারী ঃ হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ বেশী পানাহার থেকে বেঁচে থাক। কারণ, অধিক পানাহার দেহকে নষ্ট করে, রোগের জন্ম দেয় এবং কর্মে অলসতা সৃষ্টি করে। পানাহারের ক্ষেত্রে মধ্য পন্থা অবলম্বন কর। এটা দৈহিক সুস্থতার পক্ষে উপকারী এবং অপব্যয় থেকে দূরবর্তী। তিনি আরও বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা স্থূলদেহী আলেমকে পছন্দ করেন না। (অর্থাৎ, যে বেশী পানাহার করে সে নিজের প্রচেষ্টায়ই স্থূলদেহী হয়।) আরও বলেন ঃ মানুষ ততক্ষণ ধ্বংস হয় না, যতক্ষণ না সে মানসিক প্রবৃত্তিকে ধর্মের উপর অগ্রাধিকার দান করে।- (রুহুল-মা'আনী)

বায়হাকী বর্ণনা করেন, একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত আয়েশাকে দিনে দু'বার খেতে দেখে বললেন ঃ হে আয়েশা, তুমি কি পছন্দ কর যে, আহার করাই তোমার একমাত্র কাজ হোক?

এ আয়াতে পানাহার সম্পর্কে যে মধ্যবর্তিতার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে, তা শুধু পানাহারের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং পরিধান ও বসবাসের প্রত্যেক কাজেই মধ্য পন্থা পছন্দনীয় ও কাম্য। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যা ইচ্ছা পানাহার কর এবং যা ইচ্ছা পরিধান কর, তবে শুধু দু'টি বিষয় থেকে বেঁচে থাক। (এক) তাতে অপব্যয় অর্থাৎ, প্রয়োজনের চাইতে বেশী না হওয়া চাই এবং (দুই) গর্ব ও অহঙ্কার না থাকা চাই।

এক আয়াত থেকে আটটি মাসআলা ঃ মোট কথা এই যে, وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا বাক্য থেকে আটটি মাসআলার উদ্ভব হয়। (এক) যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু পানাহার করা ফরয। (দুই) শরীয়তের কোন প্রমাণ দ্বারা কোন বস্তুর অবৈধতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সব বস্তুই হালাল। (তিন) আল্লাহ্ তাআলা ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কর্তৃক নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ ব্যবহার করা অপব্যয় ও অবৈধ। (চার) যেসব বস্তু আল্লাহ্ তাআলা হালাল করেছেন, সেগুলোকে হারাম মনে করাও অপব্যয় এবং মহাপাপ। (পাঁচ) পেট ভরে খাওয়ার পরও আহার করা নাজায়েয। (ছয়) এতটুকু কম খাওয়াও অবৈধ, যদ্দরুন দুর্বল হয়ে ফরয কর্ম সম্পাদন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। (সাত) সর্বদা পানাহারের চিন্তায় মগ্ন থাকাও অপব্যয়। (আট) মনে কিছু চাইলেই তা অবশ্যই খাওয়া অপব্যয়।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে সেসব লোককে হুশিয়ার করা হয়েছে, যারা এবাদতে বাড়াবাড়ি করে এবং স্বকল্পিত সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক হালালকৃত বস্তুসমূহ থেকে বিরত থাকা এবং হারাম মনে করাকে এবাদত জ্ঞান করে। যেমন, মক্কার মুশরেকরা হজ্বের দিনগুলোতে তওয়াফ করার সময় পোশাক পরিধানকেই বৈধ মনে করত না এবং আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক হালালকৃত ও উপাদেয় খাদ্যসমূহ বর্জন করাকে এবাদত মনে করত।

এহেন লোকদেরকে শাসানোর ভঙ্গিতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, বান্দাদের জন্য সৃজিত আল্লাহ্র زينت অর্থাৎ, উত্তম পোশাক এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্যকে হারাম করেছে ?

উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য বর্জন করা ইসলামের শিক্ষা নয় ঃ উদ্দেশ্য এই যে, কোন বস্তু হালাল অথবা হারাম করা একমাত্র সে সত্তারই কাজ যিনি এসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন। এতে অন্যের হস্তক্ষেপ বৈধ নয়। কাজেই সেসব লোক দণ্ডনীয়, যারা আল্লাহ্র হালালকৃত উৎকৃষ্ট পোশাক অথবা পবিত্র ও সুস্বাদু খাদ্যকে হারাম মনে করে। সংগতি থাকা সত্ত্বেও জীর্ণাবস্থায় থাকা ইসলামের শিক্ষা নয় এবং ইসলামের দৃষ্টিতে পছন্দনীয়ও

নয়; যেমন অনেক অজ্ঞ লোক মনে করে।

পূর্ববর্তী মনীষীদের অনেককেই আল্লাহ্ তাআলা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছিলেন। তাঁরা প্রায়ই উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান পোশাক পরিধান করতেন। দু'জাহানের সর্দার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও যখন সঙ্গতিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তখন উৎকৃষ্টতর পোশাকও অঙ্গে ধারণ করেছিলেন। এক হাদীসে আছে, একবার যখন তিনি বাড়ীর বাইরে আসেন, তখন তাঁর গায়ে এমন চাদর শোভা পাচ্ছিল, যার মূল্য ছিল এক হাজার দিরহাম। বর্ণিত আছে, ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) চারশ 'গিনি মূল্যের চাদর ব্যবহার করেছেন। এমনিভাবে হযরত ইমাম মালেক (রহঃ) সব সময় উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করতেন। তাঁর জন্যে জনৈক বিত্তশালী ব্যক্তি সারা বছরের জন্যে ৩৬০ জোড়া পোশাক নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করেছিল। যে বস্ত্রজোড়া তিনি একবার পরিধান করতেন, দ্বিতীয়বার ব্যবহার করতেন না। মাত্র একদিন ব্যবহার করেই কোন দরিদ্র ছাত্রকে দিয়ে দিতেন।

কারণ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা যখন কোন বান্দাকে নেয়ামত ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন, তখন আল্লাহ্ তাআলা এ নেয়ামতের চিহ্ন তার পোশাক-পরিচ্ছদে ফুটে উঠাকে পছন্দ করেন। কেননা, নেয়ামতকে ফুটিয়ে তোলাও এক প্রকার কৃতজ্ঞতা। এর বিপরীতে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ছিন্নবস্ত্র অথবা মলিন পোশাক পরিধান করা অকৃতজ্ঞতা।

অবশ্য, দু'টি বিষয় থেকে বেঁচে থাকা জরুরী ঃ (এক) রিয়া ও নাম-যশ এবং (দুই) গর্ব ও অহঙ্কার। অর্থাৎ, শুধু লোক দেখানো এবং নিজের বড় মানুষী প্রকাশ করার জন্যে জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করা যাবে না। পূর্ববর্তী মনীষীগণ এ দু'টি বিষয় থেকে মুক্ত ছিলেন।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও বুর্ববর্তী মনীষীদের মধ্যে হযরত ওমর (রাঃ) এবং আরও কয়েকজন ছাহাবী থেকে মামুলী পোশাক কিংবা তালিযুক্ত পোশাক পরিধান করার কথা বর্ণিত আছে। এর কারণ ছিল দ্বিবিধ। প্রথম এই যে, তাঁদের হাতে যে ধনসম্পদ আসত, তা প্রায়ই ফকীর-মিসকীন ও ধর্মীয় কাজে ব্যয় করে ফেলতেন। নিজের জন্যে কিছুই অবশিষ্ট থাকত না, যদ্দ্বারা উৎকৃষ্ট পোশাক নিতে পারতেন। দ্বিতীয় এই যে, তিনি ছিলেন সবার অনুসৃত। সাদাসিধা ও সস্তা পোশাক পরে অন্যান্য শাসনকর্তাকে শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য ছিল – যাতে সাধারণ দরিদ্র ও ফকীরদের উপর তাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রভাব না পড়ে।

এমনিভাবে সূফী বুযুর্গগণ শিষ্যদেরকে প্রথম পর্যায়ে সাজ-সজ্জার পোশাক পরিধান করতে এবং উৎকৃষ্ট খাদ্য ভক্ষণ করতে নিষেধ করেন। এর উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে, এসব বস্তু স্থায়ীভাবে বর্জন করা ছওয়াবের কাজ, বরং প্রবৃত্তিকে বশে আনার জন্যে প্রথম পর্যায়ে চিকিৎসা ও প্রতিকারার্থে এধরনের সাধনার ব্যবস্থা করা হয়। যখন সে প্রবৃত্তিকে বশীভূত করে ফেলে এবং এমন স্তরে পৌঁছে যায় যে, প্রবৃত্তি তাকে হারাম ও নাজায়েযের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে না, তখন সব সূফী বুযুর্গই পূর্ববর্তী সাধক মনীষীদের ন্যায় উত্তম পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য ব্যবহার করেন। তখন এসব উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পোশাক তাঁদের জন্যে আধ্যাত্ম পথে বিঘ্ন সৃষ্টির পরিবর্তে অধিক নৈকট্য লাভের উপায় হয়ে যায়।

খোরাক ও পোশাকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সুন্নত ঃ খোরাক ও পোশাক সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ছাহাবী ও তাবেয়ীগণের সুন্নতের সারকথা এই যে, এসব ব্যাপারে লৌকিকতা পরিহার করতে হবে। যেরূপ পোশাক ও খোরাক সহজলভ্য তাই কৃতজ্ঞতা সহকারে ব্যবহার করতে হবে। মোটা ভাত ও মোটা কাপড় জুটলে যে কোন উপায়ে এমনকি, কর্জ করে হলেও উৎকৃষ্টটি অর্জনের জন্যে চেষ্টিত হবে না।

এমনিভাবে উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য জুটলে তাকে জেনে শুনে খারাপ মনে করবে না অথবা তার ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে না। উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্যের পিছনে লাগা যেমন লৌকিকতা, তেমনি উৎকৃষ্টকে নিকৃষ্ট করা কিংবা তা বাদ দিয়ে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যবহার করাও নিন্দনীয় লৌকিকতা।

আয়াতের পরবর্তী বাক্যে এর একটি বিশেষ তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, দুনিয়ার সব নেয়ামত; উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য প্রকৃতপক্ষে আনুগত্যশীল মুমিনদের জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাদের কল্যাণেই অন্যেরা ভোগ করতে পারছে। কেননা, এ দুনিয়া হচ্ছে কর্মক্ষেত্র—প্রতিদান ক্ষেত্র নয়। এখানে পার্থিব নেয়ামতের মধ্যে আসল-নকল ও ভালমন্দের পার্থক্য করা যায় না। করুণাময় আল্লাহ্ তাআলার দস্তরখান সবার জন্যে সমভাবে বিছানো রয়েছে বরং এখানে আল্লাহ্র রীতি এই যে, মুমিন ও অনুগত বান্দাদের আনুগত্যে কিছু ত্রুটি হয়ে গেলে অন্যেরা তাদের উপর প্রবল হয়ে পার্থিব নেয়ামতের ভাণ্ডার অধিকার করে বসে এবং তারা দারিদ্র্য ও উপবাসের করাল গ্রাসে পতিত হয়।

কিন্তু এ আইন শুধু এ দুনিয়ারূপী কর্মক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পরকালে সমস্ত নেয়ামত ও সুখ কেবলমাত্র আল্লাহ্র অনুগত বান্দাদের জন্যে নির্দিষ্ট থাকবে। আয়াতের এ বাক্যে তাই বলা হয়েছে ঃ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ —অর্থাৎ, আপনি বলে দিন ঃ সব পার্থিব নেয়ামত প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনেও মুমিনদেরই প্রাপ্য এবং কিয়ামতের দিন তো এককভাবে তাদের জন্যেই নির্দিষ্ট হবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের (রাঃ) মতে এ বাক্যটির অর্থ এই যে, পার্থিব সব নেয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরকালে শাস্তির কারণ হবে না- এ বিশেষ অবস্থাসহ তা একমাত্র অনুগত মুমিন বান্দাদেরই প্রাপ্য। কাফের ও পাপাচারীর অবস্থা এরূপ নয়। পার্থিব নেয়ামত তারাও পায় বরং আরও বেশী পায়;কিন্তু এসব নেয়ামত পরকালে তাদের জন্যে শাস্তি ও স্থায়ী আযাবের কারণ হবে। কাজেই পরিণামের দিক দিয়ে এসব নেয়ামত তাদের জন্যে সম্মান ও সুখের বস্তু নয়।

কোন কোন তফসীরবিদের মতে এর অর্থ এই যে, পার্থিব সব নেয়ামতের সাথে পরিশ্রম, কষ্ট, হস্তচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা ও নানারকম দুঃখ-কষ্ট লেগে থাকে, নির্ভেজাল নেয়ামত ও অনাবিল সুখের অস্তিত্ব এখানে নেই। তবে কিয়ামতে যারা এসব নেয়ামত লাভ করবে, তারা নির্ভেজাল অবস্থায় লাভ করবে। এগুলোর সাথে কোনরূপ পরিশ্রম, কষ্ট হস্তচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা এবং কোন চিন্তা-ভাবনা থাকবে না। উপরোক্ত তিন প্রকার অর্থই আয়াতের এ বাক্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তাই ছাহাবী ও তাবেয়ী তফসীরবিদগণ এসব অর্থই গ্রহণ করেছেন।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

অর্থাৎ, "আমি স্বীয় অসীম শক্তির নিদর্শনাবলী জ্ঞানবানদের জন্যে এমনিভাবে খুলে খুলে বর্ণনা করি, যাতে পণ্ডিত-মূর্খ নির্বিশেষে সবাই বুঝে নেয়।" ভাল পোশাক ও ভাল খাদ্য বর্জন করলে আল্লাহ্ তাআলা সন্তুষ্ট হন – এ আয়াতে মানুষের এ বাড়াবাড়ি ও মূর্খতাসুলভ ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে।

قَالَ ادْخُلُوْا فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ
فِي النَّارِ ؕ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ؕ حَتّٰٓى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا
جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ
عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ؕ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٨﴾
وَقَالَتْ اُوْلٰىهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ
فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٣٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَا
يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ ؕ وَكَذٰلِكَ
نَجْزِي الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٤٠﴾ لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ؕ
وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤١﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَآ ۫ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا
خٰلِدُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ ۚ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰىنَا لِهٰذَا ۫ وَمَا كُنَّا
لِنَهْتَدِيَ لَوْلَآ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ ۚ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ؕ
وَنُوْدُوْٓا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾

(৩৮) আল্লাহ্ বলবেন ঃ তোমাদের পূর্বে জিন ও মানবের যেসব সম্প্রদায় চলে গেছে, তাদের সাথে তোমরাও দোযখে যাও। যখন এক সম্প্রদায় প্রবেশ করবে; তখন অন্য সম্প্রদায়কে অভিসম্পাত করবে। এমনকি, যখন তাতে সবাই পতিত হবে, তখন পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে ঃ হে আমাদের প্রতিপালক। এরাই আমাদেরকে বিপথগামী করেছিল। অতএব, আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন। আল্লাহ্ বলবেন ঃ প্রত্যেকেরই দ্বিগুণ; তোমরা জান না। (৩৯) পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদেরকে বলবে ঃ তাহলে আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অতএব, শাস্তি আস্বাদন কর স্বীয় কর্মের কারণে। (৪০) নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে এবং এগুলো থেকে অহংকার করেছে, তাদের জন্যে আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যে পর্যন্ত না সুচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। আমি এমনিভাবে পাপীদেরকে শাস্তি প্রদান করি (৪১) তাদের জন্যে নরকাগ্নির শয্যা রয়েছে এবং উপর থেকে চাদর। আমি এমনিভাবে জালেমদেরকে শাস্তি প্রদান করি। (৪২) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে আমি কাউকে তার সামর্থ্যের চাইতে বেশী বোঝা দেই না, তারাই জান্নাতের অধিবাসী। তারা তাতেই চিরকাল থাকবে। (৪৩) তাদের অন্তরে যা কিছু দুঃখ ছিল, আমি তা বের করে দেব। তাদের তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণী প্রবাহিত হবে। তারা বলবেঃ আল্লাহ্ শোকর, যিনি আমাদেরকে এ পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। আমরা কখনও পথ পেতাম না, যদি আল্লাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করতেন। আমাদের প্রতিপালকের রসূল আমাদের কাছে সত্যকথা নিয়ে এসেছিলেন। আওয়াজ আসবে ঃ এটি জান্নাত। তোমরা এর উত্তরাধিকারী হলে তোমাদের কর্মেরপ্রতিদানে।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে কতিপয় এমন বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ্ তাআলা হারাম করেছেন। সত্য এই যে, এগুলো বর্জন করলেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা দ্বিবিধ মূর্খতায় লিপ্ত। একদিকে আল্লাহ্ তাআলার হালালকৃত উত্তম ও মনোরম বস্তুসমূহকে নিজেদের জন্যে অহেতুক হারাম সাব্যস্ত করে এসব নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং অপরদিকে যেসব বস্তু প্রকৃতপক্ষে হারাম ছিল এবং যেগুলো ব্যবহারের পরিণতিতে আল্লাহ্র গযব ও পরকালের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী ছিল, সেগুলোর ব্যবহারে লিপ্ত হয়ে পরকালের শাস্তি ক্রয় করেছে। এভাবে ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রে নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে দু'কূলই হারিয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

"যেসব বস্তুকে তোমরা অহেতুক হারাম সাব্যস্ত করেছ, সেগুলো তো হারাম নয়, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা সব নির্লজ্জ কাজ হারাম করেছেন, তা প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন হোক। আরও হারাম করেছেন প্রত্যেক পাপকাজ, অন্যায়-উৎপীড়ন, বিনা প্রমাণে আল্লাহ্র সাথে কাউকে অংশীদার করা এবং আল্লাহ্র প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যার কোন সনদ তোমাদের কাছে নেই।"

এখানে اثم (পাপকাজ) শব্দের আওতায় সেসব গোনাহ অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যেগুলো মানুষের নিজের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং بغى (উৎপীড়ন) শব্দের আওতায় অপরের সাথে লেনদেন ও অপরের অধিকার সম্পর্কিত গোনাহ্ এসে গেছে। অতঃপর শিরক ও আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ এগুলো সুস্পষ্টভাবেই বিশ্বাসগত মহাপাপ।

প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় আয়াতে মুশরেকদের দুটি ভ্রান্ত কাজ বর্ণিত হয়েছিল। (এক) হালালকে হারাম করা এবং (দুই) হারামকে হালাল করা। তৃতীয় আয়াতে তাদের ভয়াবহ পরিণাম এবং পরকালীন শাস্তি ও আযাব বর্ণনা করা হয়েছেঃ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ অর্থাৎ, যেসব অপরাধী সর্ব প্রকার অবাধ্যতা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামতের মধ্যে লালিত-পালিত হচ্ছে এবং বাহ্যতঃ তাদের উপর কোন আযাব আসতে দেখা যায় না, তারা যেন আল্লাহ্ তাআলার এ চিরাচরিত রীতি সম্পর্কে উদাসীন না থাকে যে, তিনি অপরাধীদেরকে কৃপাবশতঃ ঢিল দিতে থাকেন, যাতে কোনরকমে তারা স্বীয় কার্যকলাপ থেকে বিরত হয়; কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞানে এ ঢিল ও অবকাশের একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকে। যখন এ মেয়াদ এসে যায়, তখন এক মুহূর্তও আগেপিছে হয় না এবং তাদেরকে আযাব দ্বারা পাকড়াও করা হয়। কখনও দুনিয়াতেই আযাব এসে যায়, এবং যদি দুনিয়াতে না আসে, তবে মৃত্যুর সাথে সাথেই আযাবে প্রবিষ্ট হয়ে যায়।

এ আয়াতে নির্দিষ্ট মেয়াদের আগেপিছে না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটি এমন একটি বাকপদ্ধতি, যেমন আমাদের পরিভাষায় ক্রেতা দোকানদারকে বলে ঃ মূল্য কিছু কম-বেশী হতে পারবে কি না? এখানে জানা কথা যে, বেশী মূল্য তার কাম্য নয়- কম হবে কিনা, তাই জিজ্ঞেস করে। কিন্তু কমের অনুগামী করে বেশীও উল্লেখ করা হয়। এমনিভাবে এখানে আসল উদ্দেশ্য এই যে, নির্দিষ্ট মেয়াদের পর বিলম্ব হবে না। কিন্তু সাধারণের বাকপদ্ধতি অনুযায়ী বিলম্বের সাথে আগে হওয়া উল্লেখ করা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্বে কতিপয় আয়াতে একটি অঙ্গীকার বর্ণিত হয়েছে। এটি প্রত্যেক মানুষের কাছ থেকে তার দুনিয়াতে আগমনের পূর্বে আত্মা জগতে নেয়া হয়েছিল। অঙ্গীকারটি ছিল এই ঃ যখন আমার পয়গম্বর তোমাদের কাছে

আমার নির্দেশাবলী নিয়ে আসবেন, তখন মনে-প্রাণে সেগুলো মেনে নেবে এবং তদনুযায়ী কাজ করবে। এ কথাও বলে দেয়া হয়েছিল যে, দুনিয়াতে আগমনের পর যে ব্যক্তি এ অঙ্গীকারে অটল থেকে তা পূর্ণ করবে, সে যাবতীয় দুঃখ ও চিন্তা থেকে মুক্তি পাবে এবং চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তির অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে যে পয়গম্বরগণকে মিথ্যা বলবে এবং তাদের নির্দেশাবলী অমান্য করবে, তাদের জন্যে জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি অপেক্ষমান রয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে সে পরিস্থিতি বর্ণিত হয়েছে, যা দুনিয়াতে আগমনের পর বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সৃষ্টি করেছে। কেউ অঙ্গীকার ভুলে গিয়ে তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে আবার কেউ তাতে অটল রয়েছে এবং তদনুযায়ী সৎকর্ম সম্পাদন করেছে। এ উভয় দলের পরিণতি এবং আযাব ও ছওয়াব আলোচ্য চার আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে অঙ্গীকার ভঙ্গকারী অবিশ্বাসীদের কথা এবং শেষ দু'আয়াতে অঙ্গীকার পূর্ণকারী মুমিনদের কথা আলোচিত হয়েছে।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ যারা পয়গম্বরগণকে মিথ্যা বলেছে এবং আমার নির্দেশাবলীর প্রতি ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে, তাদের জন্যে আকাশের দরজা খোলা হবে না।

তফসীর বাহ্‌রে মুহীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এ আয়াতের বর্ণিত এক তফসীরে উল্লেখ রয়েছে যে, তাদের আমল ও তাদের দোয়ার জন্যে আকাশের দরজা খোলা হবে না। অর্থাৎ, তাদের দোয়া কবুল করা হবে না এবং তাদের আমলকে ঐ স্থানে যেতে দেয়া হবে না, যেখানে আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের আমলসমূহ সংরক্ষিত রাখা হয়। কোরআনের সূরা মুতাফফিফীনে এ স্থানটির নাম ইল্লিয়্যীন বলা হয়েছে। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও উল্লিখিত বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। বলা হয়েছে ঃ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

অর্থাৎ, মানুষের পবিত্র বাক্যাবলী আল্লাহ্ তাআলার দিকে উর্ধ্বগামী হয় এবং সৎকর্ম সেগুলোকে উত্থিত করে। অর্থাৎ, মানুষের সৎকর্মসমূহ পবিত্র ও বাক্যাবলী আল্লাহ্‌র বিশেষ দরবারে পৌঁছানোর কারণ হয়।

এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে অপর এক রেওয়ায়েত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য সাহাবী থেকে এমনও বর্ণিত আছে যে, কাফেরদের আত্মার জন্যে আকাশের দরজা খোলা হবে না। এসব আত্মাকে নীচে নিক্ষেপ করা হবে। এ বিষয়বস্তুর সমর্থন হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ)-এর ঐ হাদীস থেকে পাওয়া যায়, যা আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে-মাজা ও ইমাম আহাম্মদ বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি সংক্ষেপে এই ঃ

'রসূলুল্লাহ (সাঃ) জনৈক আনসারী সাহাবীর জানাযায় গমন করেন। কবর প্রস্তুতে কিছু বিলম্ব দেখে তিনি এক জায়গায় বসে যান। সাহাবায়ে কেরামও তাঁর চারদিকে চুপচাপ বসে যান। তিনি মাথা উঁচু করে বললেন ঃ মুমিন বান্দার মৃত্যুর সময় হলে আকাশ থেকে সাদা ধবধবে চেহারাবিশিষ্ট ফেরেশতারা আগমন করে। তাদের সাথে জান্নাতের কাফন ও সুগন্ধি থাকে। তারা মরণোন্মুখ ব্যক্তির সামনে বসে যায়। অতঃপর মৃত্যুদূত আযরাঈল আসেন এবং তার আত্মাকে সম্বোধন করে বলেন ঃ হে নিশ্চিন্ত আত্মা, পালনকর্তা মাগফেরাত ও সন্তুষ্টির জন্যে বের হয়ে আস। তখন তার আত্মা এমন অনায়াসে বের হয়ে আসে, যেমন মশকের মুখ খুলে দিলে তার পানি বের হয়ে আসে। মৃত্যুদূত তার আত্মাকে হাতে নিয়ে উপস্থিত ফেরেশতাদের কাছে সমর্পন করেন। ফেরেশতারা তা নিয়ে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে একদল ফেরেশতার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারা জিজ্ঞেস করে ঃ এ পাক আত্মা কার? ফেরেশতারা তার ঐ নাম ও উপাধি উল্লেখ করে, যা দুনিয়াতে তার সম্মানার্থ ব্যবহার হত এবং বলে ঃ ইনি হচ্ছেন অমুকের পুত্র অমুক। ফেরেশতারা তার আত্মাকে নিয়ে প্রথম আকাশে পৌঁছে দরজা খোলতে বলে। দরজা খোলা হয়। এখান থেকে আরও ফেরেশতা তাদের সঙ্গী হয়। এভাবে তারা সপ্তম আকাশে পৌঁছে। তখন আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ আমার এ বান্দার আমলনামা ইল্লিয়্যীনে লিখ এবং তাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দাও। এ আত্মা আবার কবরে ফিরে আসে। কবরে হিসাব গ্রহণকারী ফেরেশতা এসে তাকে উপবেশন করায় এবং প্রশ্ন করে ঃ তোমার পালনকর্তা কে? তোমার ধর্ম কি? সে বলে, আমার পালনকর্তা আল্লাহ্ তাআলা এবং ধর্ম ইসলাম। এর পর প্রশ্ন হয় ঃ এই যে ব্যক্তি, যিনি তোমাদের জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন,তিনি কে? সে বলে ঃ ইনি আল্লাহ্‌র রসূল। তখন একটি গায়েবী আওয়াজ হয় যে, আমার বান্দা সত্যবাদী। তার জন্যে জান্নাতের শয্যা পেতে দাও, জান্নাতের পোষাক পরিয়ে দাও এবং জান্নাতের দিকে তার দরজা খুলে দাও। এ দরজা দিয়ে জান্নাতের সুগন্ধি ও বাতাস আসতে থাকে। তার সৎকর্ম একটি সুশ্রী আকৃতি ধারণ করে তাকে সঙ্গ দেয়ার জন্যে তার কাছে এসে যায়।

'এর বিপরীতে কাফেরের মৃত্যু সময় উপস্থিত হলে আকাশ থেকে কাল রঙের ভয়ঙ্কর মূর্তি ফেরেশতা নিকৃষ্ট চট নিয়ে আগমন করে এবং তার বিপরীত দিকে বসে যায়। অতঃপর মৃত্যুদূত তার আত্মা এমনভাবে বের করে, যেমন কোন কাঁটা-বিশিষ্ট শাখা ভিজা পশমে জড়িয়ে থাকলে তাকে সেখান থেকে টেনে বের করা হয়। আত্মা বের হলে তার দুর্গন্ধ মৃত জন্তুর দুর্গন্ধের চাইতেও প্রকট হয়। ফেরেশতারা তাকে নিয়ে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে একদল ফেশেতার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারা জিজ্ঞেস করে ঃ এ দুরাত্মাটি কার? ফেরেশতারা তখন তার ঐ হীনতম নাম ও উপাধি উল্লেখ করে, যদ্দারা সে দুনিয়াতে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ, সে অমুকের পুত্র অমুক। অতঃপর প্রথম আকাশে পৌঁছে দরজা খুলতে বললে তার জন্যে দরজা খোলা হয় না বরং নির্দেশ আসে যে, এ বান্দার আমলনামা সিজ্জীনে রেখে দাও। সেখানে অবাধ্য বান্দাদের আমলনামা রাখা হয়। এ আত্মাকে নীচে নিক্ষেপ করা হয় এবং তা পুনরায় দেহে প্রবেশ করে। ফেরেশতারা তাকে কবরে বসিয়ে মুমিন বান্দার অনুরূপ প্রশ্ন করে। সে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে কেবল هاه هاه لا ادرى (হায় হায় আমি জানি না) বলে। তাকে জাহান্নামের শয্যা ও জাহান্নামের পোষাক দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দিকে দরজা খুলে দেয়া হয়। ফলে তার কবরে জাহান্নামের উত্তাপ পৌঁছতে থাকে এবং কবরকে তার জন্যে সংকীর্ণ করে দেয়া হয়।

আয়াতের শেষে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ

يلج শব্দটি ولوج থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সংকীর্ণ জায়গায় প্রবেশ করা। جمل এর অর্থ উট এবং سم এর অর্থ সূচের ছিদ্র। অর্থ এই যে, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না উটের মত বিরাট বপু জন্তু সূচের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করবে। উদ্দেশ্য এই যে, সূচের ছিদ্রে উট প্রবেশ করা যেমন স্বভাবতঃ অসম্ভব, তেমনি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাও অসম্ভব। এতে তাদের চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অতঃপর তাদের আযাবের অধিকতর তীব্রতা বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ - مِهَادٌ শব্দের অর্থ বিছানা এবং غَوَاشٍ শব্দটি غَاشِيَةٌ এর বহুবচন। এর অর্থ আবৃতকারী বস্তু। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের চাদর ও শয্যা সবই জাহান্নামের

হবে। প্রথম আয়াতে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা বলা হয়েছিল। তার শেষে وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِيْنَ বলা হয়েছিল। দ্বিতীয় আয়াতে জাহান্নামের শাস্তি বর্ণনা করার পর وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ বলা হয়েছে। কেননা, এটি আগেরটির চাইতে গুরুতর।

তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী যারা পালন করে, তাদের কথা বলা হয়েছে যে, তারা জান্নাতের অধিবাসী এবং জান্নাতেই অনন্তকাল বসবাস করবে।

শরীয়তের নির্দেশাবলী সহজ করা হয়েছে ঃ কিন্তু তাদের জন্যে সেখানে বিশ্বাস স্থাপন করা ও সৎকর্ম সম্পাদন করার শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, কৃপাবশত ঃ এ কথাও বলা হয়েছে ঃ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা কোন বান্দার উপর এমন বোঝা চাপান না, যা তার শক্তি ও সাধ্যের বাইরে। উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতে প্রবেশ করার জন্যে যেসব সৎকর্ম শর্ত করা হয়েছে, সেগুলো মানুষের সাধ্যাতীত কঠিন কাজ নয়। বরং আল্লাহ্ তাআলা প্রতি ক্ষেত্রেই শরীয়তের নির্দেশাবলী নরম ও সহজ করেছেন। প্রত্যেক নির্দেশে অসুস্থতা, দুর্বলতা, সফর ও অন্যান্য মানবিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

তফসীর বাহ্‌রে মুহীতে বলা হয়েছে ঃ মানুষকে সৎকর্মের আদেশ দেয়ার সময় এরূপ সম্ভাবনা ছিল যে, সব সৎকর্ম সর্বত্র ও সর্বাবস্থায় পালন করা মানুষের সাধ্যাতীত হওয়ার কারণে আদেশটি তাদের জন্যে কঠিন হতে পারে। তাই এ সন্দেহ দূরীকরণার্থে বলা হয়েছে ঃ আমি মানব জীবনের সকল কাল ও অবস্থা যাচাই করে সর্বাবস্থায় সব সময় ও সব জায়গার জন্যে উপযুক্ত নির্দেশাবলী প্রদান করি। এগুলোর বাস্তবায়ন মোটেই কঠিন কাজ নয়।

জান্নাতীদের মন থেকে পারস্পরিক মালিন্য অপসারণ করা হবে ঃ চতুর্থ আয়াতে জান্নাতীদের দু'টি বিশেষ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। (এক) ঃ وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ অর্থাৎ, জান্নাতীদের অন্তরে পরস্পরের পক্ষ থেকে যদি কোন মালিন্য থাকে, তবে আমি তা তাদের অন্তর থেকে অপসারণ করে দেব। তারা একে অপরের প্রতি সন্তুষ্টি ও ভাই ভাই হয়ে জান্নাতে যাবে এবং বসবাস করবে।

ছহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, মুমিনরা যখন পুলসিরাত অতিক্রম করে জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ করবে, তখন জান্নাত ও দোযখের মধ্যবর্তী এক পুলের উপর তাদেরকে থামিয়ে দেয়া হবে। তাদের পরস্পরের মধ্যে যদি কারও প্রতি কারও কোন কষ্ট থাকে কিংবা কারও কাছে কারও পাওনা থাকে, তবে এখানে পৌঁছে পরস্পরে প্রতিদান নিয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক পরিষ্কার করে নেবে। এভাবে হিংসা দ্বেষ, শত্রুতা, ঘৃণা ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণ পূতপবিত্র হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তফসীর মাযহারীতে আছে, এ পুল বাহ্যতঃ পুলসিরাতের শেষ প্রান্ত এবং জান্নাত সংলগ্ন। আল্লামা সুয়ূতী প্রমুখ এ মতই গ্রহণ করেছেন।

এ স্থলে যেসব পাওনা দাবী করা হবে সেগুলো টাকা পয়সা দ্বারা পরিশোধ করা যাবে না। কারণ, সেখানে কারও কাছে টাকা-পয়সা থাকবে না। মুসলিমের এক হাদীস অনুযায়ী সৎকর্ম দ্বারা এ সব পাওনা পরিশোধ করা হবে। যদি কারও সৎকর্ম এভাবে নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং তার পরেও পাওনা বাকী থাকে, তবে প্রাপকের গোনাহ্ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরূপ ব্যক্তিকে সর্বাধিক নিঃস্ব বলে আখ্যা দিয়েছেন, যে দুনিয়াতে সৎকর্ম সম্পাদন করে, কিন্তু অপরের পাওনার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না, ফলে পরকালে সে যাবতীয় সৎকর্ম থেকে রিক্তহস্ত হয়ে পড়ে।

এ হাদীসে পাওনা পরিশোধের সাধারণ বিধি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সবার ক্ষেত্রে এরূপ করা জরুরী নয়। ইবনে কাছীর ও তফসীরে মাযহারীর বর্ণনা অনুযায়ী সেখানে প্রতিশোধ গ্রহণ ব্যতিরেকে পারস্পরিক হিংসা ও মালিন্য দূর হয়ে যাওয়াও সম্ভব।

যেমন, কোন কোন হাদীসে আছে, তারা পুলসিরাত অতিক্রম করে একটি ঝর্ণার কাছে পৌঁছবে এবং পানি পান করবে। এ পানির বৈশিষ্ট্য এই যে, সবার মন থেকে পারস্পরিক হিংসা ও মালিন্য ধোয়ে-মুছে যাবে। ইমাম কুরতবী (রহঃ) কোরআন পাকের وَسَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا আয়াতের তফসীরও তাই বর্ণনা করেছেন যে, এ পানি দ্বারা সবার মনের কলহ ও মালিন্য ধোয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

হযরত আলী মুর্তযা (রাঃ) একবার এ আয়াতে পাঠ করে বললেন ঃ আমি আশা করি আমি, ওসমান, তালহা ও যুবায়ের ঐ সব লোকের অন্তর্ভুক্ত হব, যাদের বক্ষ জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে মনোমালিন্য থেকে পরিষ্কার করে দেয়া হবে। (ইবনে কাসীর) বলাবাহুল্য, দুনিয়াতে তাঁদের পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দেয়ার ফলে যুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত হয়েছিল।

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত জান্নাতীদের দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, জান্নাতে পৌঁছে তারা আল্লাহ্ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে যে, তিনি তাদেরকে জান্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং জান্নাতের পথ সহজ করে দিয়েছেন। তারা বলবে ঃ যদি আল্লাহ্ তাআলা কৃপা না করতেন, তবে এখানে পৌঁছার সাধ্য আমাদের ছিল না।

এতে বোঝা যায় যে, কোন মানুষ কেবল স্বীয় প্রচেষ্টায় জান্নাতে যেতে পারে না, যে পর্যন্ত না তার প্রতি আল্লাহ্ তাআলার কৃপা হয়। কেননা, স্বয়ং প্রচেষ্টা তার ইচ্ছাধীন নয়। এটাও শুধু আল্লাহ্ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহেই অর্জিত হয়ে থাকে।

হেদায়তের বিভিন্ন স্তর ঃ ইমাম রাগেব ইস্পাহানী 'হেদায়েত' শব্দের ব্যাখ্যায় অত্যন্ত চমৎকার ও গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তা এই যে, 'হেদায়েত' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক। এর বিভিন্ন স্তর রয়েছে। সত্য এই যে, আল্লাহ্‌র দিকে যাওয়ার পথ প্রাপ্তির নামই হেদায়েত। তাই আল্লাহ্‌র নৈকট্যের স্তর যেমন বিভিন্ন ও অনন্ত, তেমনি হেদায়াতের স্তরও অত্যধিক বিভিন্ন। কুফর ও শিরক থেকে মুক্তি ও ঈমান এর সর্বনিম্ন স্তর। এরই মাধ্যমে মানুষের গতিধারা ভ্রান্ত পথ থেকে সরে আল্লাহ্ মুখী হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা ও বান্দার মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে, তা অতিক্রম করার প্রত্যেক স্তরই হেদায়েত। তাই হেদায়াত অন্বেষণ থেকে কখনও কোন মানব এমনকি, নবী-রসূল পর্যন্ত নির্লিপ্ত হতে পারেন না। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জীবনের শেষ পর্যন্ত اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ দোয়াটি যেমন উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন, তেমনি নিজেও যত্নসহকারে অব্যাহত রেখেছেন। কেননা, আল্লাহ্‌র নৈকট্যের স্তরের কোন শেষ নেই। এমন কি, আলোচ্য আয়াতে জান্নাতে প্রবেশকেও হেদায়েত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা, এটি হচ্ছে হেদায়েতের সর্বশেষ স্তর।

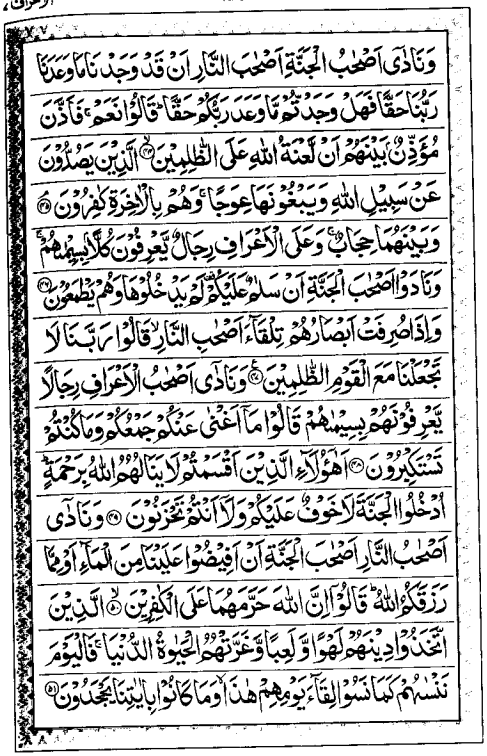

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا
رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۭ قَالُوْا نَعَمْ ۚ فَاَذَّنَ
مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَي الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٤﴾ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ ﴿٤٥﴾
وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَي الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّا ۢ بِسِيْمٰىهُمْ ۚ
وَنَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۣ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ ﴿٤٦﴾
وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَاۗءَ اَصْحٰبِ النَّارِ ۙ قَالُوْا رَبَّنَا لَا
تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا
يَّعْرِفُوْنَهُمْ بِسِيْمٰىهُمْ قَالُوْا مَآ اَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ
تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٤٨﴾ اَهٰٓؤُلَاۗءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ۭ
اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَنَادٰٓى
اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاۗءِ اَوْ مِمَّا
رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۭ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَي الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٠﴾ الَّذِيْنَ
اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّلَعِبًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ
نَنْسٰىهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَاۗءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا ۙ وَمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿٥١﴾

(৪৪) জান্নাতীরা দোযখীদেরকে ডেকে বলবে ঃ আমাদের সাথে আমাদের প্রতিপালক যে ওয়াদা করেছিলেন, তা আমরা সত্য পেয়েছি। অতএব, তোমরাও কি তোমাদের প্রতিপালকের ওয়াদা সত্য পেয়েছ? তারা বলবে ঃ হ্যাঁ। অতঃপর একজন ঘোষক উভয়ের মাঝখানে ঘোষণা করবে ঃ আল্লাহর অভিসম্পাত জালেমদের উপর, (৪৫) যারা আল্লাহর পথে বাধা দিত এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করত। তারা পরকালের বিষয়েও অবিশ্বাসী ছিল। (৪৬) উভয়ের মাঝখানে একটি প্রাচীর থাকবে এবং আরাফের উপরে অনেক লোক থাকবে। তারা প্রত্যেককে তার চিহ্ন দ্বারা চিনে নেবে। তারা জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবে ঃ তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তারা তখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না, কিন্তু প্রবেশ করার ব্যাপারে আগ্রহী হবে। (৪৭) যখন তাদের দৃষ্টি দোযখীদের উপর পড়বে, তখন বলবে ঃ হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে এ জালেমদের সাথী করো না। (৪৮) আরাফবাসীরা যাদেরকে তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনবে, তাদেরকে ডেকে বলবে তোমাদের দলবল ও ঔদ্ধত্য তোমাদের কোন কাজে আসেনি। (৪৯) এরা কি তারাই; যাদের সম্পর্কে তোমরা কসম খেয়ে বলতে যে, আল্লাহ্‌ এদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন না। প্রবেশ কর জান্নাতে। তোমাদের কোন আশঙ্কা নেই এবং তোমরা দুঃখিত হবে না। (৫০) দোযখীরা জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবে ঃ আমাদের উপর সামান্য পানি নিক্ষেপ কর অথবা আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছেন, তা থেকেই কিছু দাও। তারা বলবে ঃ আল্লাহ্‌ এই উভয় বস্তু কাফেরদের জন্যে নিষিদ্ধ করেছেন, (৫১) তারা স্বীয় ধর্মকে তামাশা ও খেলা বানিয়ে নিয়েছিল এবং পার্থিব জীবন তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল। অতএব, আমি আজকে তাদেরকে ভুলে যাব; যেমন তারা এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিল এবং যেমন তারা আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জান্নাতীরা জান্নাতে এবং দোযখীরা দোযখে নিজ নিজ ঠিকানায় পৌছে গেলে বাহ্যতঃই উভয় স্থানের মধ্যে সব দিক দিয়ে বিরাট ব্যবধান হবে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কোরআন পাকের অনেক আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, উভয় স্থানের মাঝখানে এমন কিছু রাস্তা থাকবে, যার ফলে একে অপরকে দেখতে পারবে এবং পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা ও প্রশ্নোত্তর হবে।

সূরা ছাফফাতে দু' ব্যক্তির কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা দুনিয়াতে একে অপরের সঙ্গী ছিল ; কিন্তু একজন ছিল মুমিন আর অপর জন ছিল কাফের। পরকালে যখন মুমিন জান্নাতে এবং কাফের দোযখে চলে যাবে, তখন তারা এখে অপরকে দেখবে এবং কথাবার্তা বলবে। বলা হয়েছে ঃ ''জান্নাতী সাথী উঁকি দিয়ে দোযখী সাথীকে দেখবে এবং তাকে দোযখের মধ্যস্থলে পতিত পাবে। সে বলবে ঃ হতভাগা, তোর ইচ্ছা ছিল আমিও তোর মত বরবাদ হয়ে যাই। যদি আল্লাহ্‌র কৃপা না হত, তবে আজ আমিও তোর সাথে জাহান্নামে পড়ে থাকতাম। তুই আমাকে বলতে যে, এ দুনিয়ার মৃত্যুর পর কোন জীবন, কোন হিসাব-কিতাব বা সওয়াব-আযাব হবে না।'' এখন দেখলি এসব কি হচ্ছে?

আলোচ্য আয়াতসমূহ ও পরবর্তী প্রায় এক রুকূ পর্যন্ত এধরনেরই কথাবার্তা ও প্রশ্নোত্তর বর্ণিত হয়েছে, যা জান্নাতী ও দোযখীদের মধ্যে হবে।

জান্নাত ও দোযখের মাঝখানে একে অপরকে দেখা ও কথাবার্তা বলার পথও প্রকৃতপক্ষে দোযখীদের জন্যে এক প্রকার আযাব হবে। চারদিক থেকে তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষিত হবে। জান্নাতীদের নেয়ামত ও সুখ দেখে দোযখের আগুনের সাথে সাথে অনুতাপের আগুনেও তারা দগ্ধ হবে। অপরপক্ষে জান্নাতীদের নেয়ামত ও সুখে এক নতুন সংযোজন হবে। কেননা, প্রতিপক্ষের বিপদ দেখে নিজ সুখ ও নেয়ামতের মূল্য বেড়ে যাবে। যারা দুনিয়াতে ধার্মিকদের প্রতি বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করত এবং তারা কোনরূপ প্রতিশোধ নিত না, আজ তাদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় আযাবে পতিত দেখে তারা হাসবে যে, তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল তারা পেয়ে গেছে। কোরআন পাকে এ বিষয়টি সূরা 'মুতাফফেফীনে' এভাবে বিধৃত হয়েছে ঃ

فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ عَلَى الْاَرَاۗىِٕكِ
يَنْظُرُوْنَ - هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ

দোযখীদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতার জন্যে হুশিয়ারী এবং বোকাসুলভ কথাবার্তার জন্যে ফেরেশতাদের পক্ষ থেকও তিরস্কার করা হবে। তারা তাদেরকে সম্বোধন করে বলবে ঃ - هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ اَفَسِحْرٌ هٰذَآ اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ এ হচ্ছে ঐ আগুন, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে। এখন দেখ এটা কি জাদু, না তোমরা চোখে দেখ না।

এমনিভাবে আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, জান্নাতীরা দোযখীদেরকে প্রশ্ন করবে ঃ আমাদের পালনকর্তা আমাদের সাথে যেসব নেয়ামত ও সুখের ওয়াদা করেছিলেন, আমরা সেগুলো সম্পূর্ণ সঠিক পেয়েছি। তোমরা বল, তোমাদেরকে যে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল, তা তোমাদের সামনে এসেছে কিনা? তারা স্বীকার করবে যে, নিঃসন্দেহে আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি।

তাদের এ প্রশ্নোত্তরের সমর্থনে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন ফেরেশতা ঘোষণা করবে যে, জালেমদের উপর আল্লাহ্ তাআলার অভিসম্পাত হোক। তারা মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে আসতে বাধা দিত এবং পরকালে অবিশ্বাস করত।

আ'রাফবাসী কারা ঃ জান্নাতী ও দোযখীদের পারস্পরিক কথাবার্তা প্রসঙ্গে তৃতীয় আয়াতে আরও একটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে যে, কিছু লোক এমনও থাকবে, যারা দোযখ থেকে তো মুক্তি পাবে, কিন্তু তখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করার আশা পোষণ করবে। তাদেরকেই আ'রাফবাসী বলা হয়।

আ'রাফ কি? সূরা হাদীদের আয়াত থেকে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এতে জানা যায় যে, হাশরের ময়দানে তিনটি দল হবে। (এক) সুস্পষ্ট কাফের ও মুশরিক। এদের পুলসেরাতে চলার প্রশ্নই উঠবে না। এর আগেই জাহান্নামের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়া হবে। (দুই) মুমিনের দল। তাদের সাথে ঈমানরে আলো থাকবে। (তিন) মুনাফেকের দল। এরা দুনিয়াতে মুসলমানদের সাথে লাগা থাকত। সেখানেও প্রথম দিকে সাথে লাগা থাকবে এবং পুলসেরাতে চলতে শুরু করবে। তখন একটি ভীষণ অন্ধকার সবাইকে ঘিরে ফেলবে। মুমিনরা ঈমানের আলোর সাহায্যে সামনে এগিয়ে যাবে। মুনাফেকরা ডেকে ডেকে তাদেরকে বলবে ঃ একটু আস। আমরাও তোমাদের আলো দ্বারা উপকৃত হই। এতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন ফেরেশতা বলবে ঃ পেছনে ফিরে যাও এবং সেখানেই আলো তালাশ কর। উদ্দেশ্য এই যে, এ আলো হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্মের। এ আলো হাসিল করার স্থান পেছনে চলে গেছে। যারা সেখানে ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে এ আলো অর্জন করেনি, তারা আজ আলো দ্বারা উপকৃত হবে না। এমতাবস্থায় মুমিন ও মুনাফেকদের মধ্যে একটি প্রাচীর বেষ্টনী দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে। এতে একটি দরজা থাকবে। দরজার বাইরে কেবলই আযাব দৃষ্টিগোচর হবে এবং ভেতরে মুমিনরা থাকবে। তাদের সামনে আল্লাহ্‌র রহমত এবং জান্নাতের মনোরম পরিবেশ বিরাজ করবে।

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ

ইবনে জরীর ও অন্যান্য তফসীরের মতে এ আয়াতে حِجَابٌ বলে ঐ প্রাচীর বেষ্টনীকেই বোঝানো হয়েছে। এ প্রাচীর বেষ্টনীর উপরিভাগের নামই আ'রাফ। কেননা, আ'রাফ'ওরফে'র বহুবচন। এর অর্থ প্রত্যেক বস্তুর উপরিভাগ। কারণ, দূর থেকে এ ভাগই 'মারাফ' তথা খ্যাত হয়ে থাকে। এ ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল যে, জান্নাত ও দোযখের মধ্যবর্তী প্রাচীর–বেষ্টনীর উপরিভাগকে আ'রাফ বলা হয়। আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাশরে এ স্থানে কিছুসংখ্যক লোক থাকবে। তারা জান্নাত ও দোযখ উভয় দিকের অবস্থা নিরীক্ষণ করবে এবং উভয়পক্ষের লোকদের সাথে প্রশ্নোত্তর ও কথাবার্তা বলবে।

সালামের মসনুন শব্দ ঃ আ'রাফবাসীদের ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা জ্ঞাত হওয়ার পর এখন আয়াতের বিষয়বস্তু দেখুন। বলা হয়েছে ঃ আ'রাফবাসীরা জান্নাতীদের ডেকে বলবে ঃ সালামুন আলাইকুম। এ বাক্যটি দুনিয়াতেও পারস্পরিক সাক্ষাতের সময় সম্মান প্রদর্শনার্থ বলা হয় এবং বলা সুন্নত। মৃত্যুর পর কবর যিয়ারতের সময় এবং হাশর ও কেয়ামতেও বলা হবে। কিন্তু আয়াত ও হাদীসদৃষ্টে জানা যায় যে, দুনিয়াতে আসসালামু আলাইকুম বলা সুন্নত। কবর যিয়ারতের জন্যে কোরআন পাকে سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ উল্লেখিত হয়েছে। ফেরেশতাগণ যখন জান্নাতীদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে, তখনও বলা হবে – سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ আলোচ্য আয়াতেও আ'রাফবাসীরা জান্নাতীদেরকে এ বাক্য দ্বারা সালাম করবে।

অতঃপর আ'রাফবাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা এখনও জান্নাতে প্রবেশ করেনি, কিন্তু এ ব্যাপারে আগ্রহী। অতঃপর বলা হয়েছে "আরাফবাসীদের দৃষ্টি যখন দোযখীদের উপর পড়বে এবং তাদের শাস্তি ও বিপদ প্রত্যক্ষ করবে, তখন আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে যে, আমাদেরকে এসব জালেমের সাথী করবেন না।"

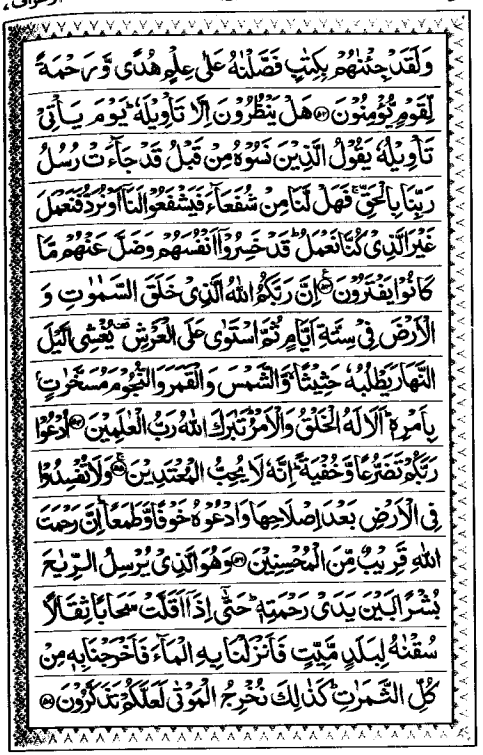

وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً
لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ يَوْمَ يَاْتِيْ
تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ
رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَآ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ
غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا
كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٥٣﴾ اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي الَّيْلَ
النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ
بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٥٤﴾ اُدْعُوْا
رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٥٥﴾ وَلَا تُفْسِدُوْا
فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا اِنَّ رَحْمَتَ
اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٦﴾ وَهُوَ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ
بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ حَتّٰٓى اِذَآ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا
سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ
كُلِّ الثَّمَرٰتِ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٧﴾

(৫২) আমি তাদের কাছে গ্রন্থ পৌছিয়েছি, যা আমি স্বীয় জ্ঞানে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি, যা পথপ্রদর্শক এবং মুমিনদের জন্যে রহমত। (৫৩) তারা কি এখন এ অপেক্ষায়ই আছে যে, এর বিষয়বস্তু প্রকাশিত হোক? যেদিন এর বিষয়বস্তু প্রকাশিত হবে, সেদিন পূর্বে যারা একে ভুলে গিয়েছিল, তারা বলবে : বাস্তবিকই আমাদের প্রতিপালকের পয়গম্বরগণ সত্যসহ আগমন করেছিলেন। অতএব, আমাদের জন্যে কোন সুপারিশকারী আছে কি যে, সুপারিশ করবে অথবা আমাদেরকে পুনঃ প্রেরণ করা হলে আমরা পূর্বে যা করতাম তার বিপরীত কাজ করে আসতাম। নিশ্চয় তারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তারা মনগড়া যা বলত, তা উধাও হয়ে যাবে। (৫৪) নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি পরিয়ে দেন রাতের উপর দিনকে এমতাবস্থায় যে, দিন দৌড়ে দৌড়ে রাতের পিছনে আসে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র স্বীয় আদেশের অনুগামী। শুনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ্, বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। (৫৫) তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক, কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (৫৬) পৃথিবীকে কুসংস্কারমুক্ত ও ঠিক করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। তাঁকে আহবান কর ভয় ও আশা সহকারে। নিশ্চয় আল্লাহ্র করুণা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী। (৫৭) তিনিই বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদবাহী বায়ু পাঠিয়ে দেন। এমনকি যখন বায়ুরাশি পানিপূর্ণ মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি এ মেঘমালাকে একটি মৃত শহরের দিকে হাঁকিয়ে দেই। অতঃপর এ মেঘ থেকে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করি। অতঃপর পানি দ্বারা সব রকমের ফল উৎপন্ন করি। এমনিভাবে মৃতদেরকে বের করব— যাতে তোমরা চিন্তা কর।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য তৃতীয় আয়াতে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করা এবং একটি বিশেষ অটল ব্যবস্থার অনুগামী হয়ে তাদের নিজ নিজ কাজে নিয়োজিত থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলার অসীম শক্তির কথা বর্ণনা করে প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষকে চিন্তার আহবান জানানো হয়েছে যে, যে পবিত্র সত্তা এ বিশাল বিশ্ব সৃষ্টি করতে এবং বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থাধীনে পরিচালনা করতে সক্ষম, তাঁর জন্য এসব বস্তুকে ধ্বংস করে কেয়ামতের দিন পুনরায় সৃষ্টি করা কি কঠিন কাজ? তাই কেয়ামতকে অস্বীকার না করে একমাত্র তাঁকেই স্বীয় পালনকর্তা মনে কর, তার কাছেই প্রয়োজনাদি প্রার্থনা কর, তাঁরই এবাদত কর এবং সৃষ্ট বস্তুকে পূজা করার পঙ্কিলতা থেকে বের হয়ে সত্যকে চিন। এ আয়াতে বলা হয়েছেঃ আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদের পালনকর্তা। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন।

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করার কারণ : এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র বিশ্বকে মুহূর্তের মধ্যে সৃষ্টি করতে সক্ষম। স্বয়ং কোরআন পাকেও বিভিন্ন ভঙ্গিতে একথা বার বার বলা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে ঃ ''এক নিমেষের মধ্যে আমার আদেশ কার্যকরী হয়ে যায়।'' কোথাও বলা হয়েছে ঃ

''আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বস্তু সৃষ্টি করতে চান, তখন বলে দেন ঃ হয়ে যাও। আর সঙ্গে সঙ্গে তা সৃষ্টি হয়ে যায়''। এমতাবস্থায় বিশ্ব সৃষ্টিতে ছয় দিন লাগার কারণ কি?

তফসীরবিদ হযরত সায়ীদ ইবনে জোবায়র (রঃ) এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার মহাশক্তি নিঃসন্দেহে এক নিমেষে সব কিছু সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু মানুষকে বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনায় ধারাবাহিকতা ও কর্মপক্কতা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যেই এতে ছয় দিন ব্যয় করা হয়েছে।

নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্টির পূর্বে দিবা-রাত্রির পরিচয় কি ছিল?

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, সূর্যের পরিক্রমণের ফলে দিন ও রাত্রির সৃষ্টি। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির পূর্বে যখন চন্দ্র-সূর্যই ছিল না, তখন ছয় দিনের সংখ্যা কি হিসাবে নিরূপিত হল?

কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন ঃ ছয় দিন বলে এতটুকু সময় বোঝানো হয়েছে, যা এ জগতের হিসাবে ছয় দিন হয়। কিন্তু পরিষ্কার ও নির্মল উত্তর এই যে, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে দিন এবং সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত যে রাত এটা এ জগতের পরিভাষা। বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দিবা-রাত্রির পরিচয়ের অন্য কোন লক্ষণ নির্দিষ্ট থাকতে পারে; যেমন জান্নাতের দিবা-রাত্রি সূর্যের পরিক্রমণের অনুগামী হবেনা।

সহীহ্ রেওয়ায়েত অনুযায়ী যে ছয় দিনে জগত সৃষ্টি হয়েছে তা রবিবার থেকে শুরু করে শুক্রবারে শেষ হয়। শনিবারে জগত সৃষ্টির কাজ হয়নি। কোন কোন আলেম বলেন سبت -এর অর্থ কর্তন করা। এদিনে কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে এদিনকে يوم السبت (শনিবার) বলা হয়। - (ইবনে কাসীর)

আলোচ্য আয়াতে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি ছয় দিনে সমাপ্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সুরা হা-মী-ম সেজদার নবম ও দশম আয়াতে এর বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, দু'দিনে ভূমণ্ডল, দু'দিনে ভূমণ্ডলের

পাহাড়, সমুদ্র, খনি, বৃক্ষ, উদ্ভিদ এবং মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের পানাহারের বস্তু – সামগ্রী সৃষ্টি করা হয়েছে। মোট চার দিন হল। বলা হয়েছে ঃ خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ

আবার বলা হয়েছে ঃ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ

যে দু'দিনে ভূমণ্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে, তা ছিল রবিবার ও সোমবার। দ্বিতীয় দু'দিন ছিল মঙ্গল ও বুধ, যাতে ভূমণ্ডলের সাজ-সরঞ্জাম পাহাড়, নদী ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়। এরপর বলা হয়েছে ঃ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ অর্থাৎ, অতঃপর সাত আকাশ সৃষ্টি করেন দুদিনে। বাহ্যত ঃ এ দুদিন হবে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার। এভাবে শুক্রবার পর্যন্ত ছয় দিন হল।

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজনের কথা বর্ণনার পর বলা হয়েছে ঃ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ অর্থাৎ, অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হলেন। اسْتَوَىٰ – এর শাব্দিক অর্থ অধিষ্ঠিত হওয়া। 'আরশ' রাজসিংহাসনকে বলা হয়। এখন আল্লাহ্‌র 'আরশ' কিরূপ এবং কি— এর উপর অধিষ্ঠিত হওয়ার অর্থই বা কি? এ সম্পর্কে নির্মল, পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ মাযহাব সাহাবী ও তাবেয়ীদের কাছ থেকে এবং পরবর্তীকালে সূফী বুযুর্গদের কাছ থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, মানব জ্ঞান আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলীর স্বরূপ পূর্ণরূপে বুঝতে অক্ষম। এর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া অর্থহীন; বরং ক্ষতিকরও বটে। এ সম্পর্কে সংক্ষেপে এরূপ বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত যে, এসব বাক্যের যে অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দিষ্ট, তাই শুদ্ধ ও সত্য। এরপর নিজে কোন অর্থ উদ্ভাবন করার চিন্তা করাও অনুচিত।

হযরত ইমাম মালেক (রহঃ)-কে কেউ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ – এর অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন ঃ استواء শব্দের অর্থ তো জানাই আছে; কিন্তু এর স্বরূপ ও অবস্থা মানব বুদ্ধি সম্যক বুঝতে অক্ষম। এতে বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজেব। এর অবস্থা ও স্বরূপ জিজ্ঞেস করা বেদআত। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এ ধরনের প্রশ্ন করেননি। সুফিয়ান সওরী, ইমাম আওযায়ী, লায়স ইবনে সা'দ, সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা, আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক (রহঃ) প্রমুখ বলেছেন ঃ যেসব আয়াত আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে, সেগুলোর প্রতি যেভাবে আছে সেভাবে রেখেই কোনরূপ ব্যাখ্যা ও সদর্থ ছাড়াই বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত। – (মাযহারী)

এরপর বলা হয়েছে ঃ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা রাত্রি দ্বারা দিনকে সমাচ্ছন্ন করেন এভাবে যে, রাত্রি দ্রুত দিনকে ধরে ফেলে। উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র বিশ্বকে আলো থেকে অন্ধকারে অথবা অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন। দিবা-রাত্রির এ বিরাট পরিবর্তন আল্লাহ্‌র কুদরতে অতি দ্রুত ও সহজে সম্পন্ন হয়ে যায়— মোটেই দেরী হয় না।

এরপর বলা হয়েছে ঃ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহকে এমতাবস্থায় সৃষ্টি করেছেন যে, সবাই আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের অনুগামী।

এতে প্রত্যেক বুদ্ধিমানের জন্যে চিন্তার খোরাক রয়েছে। বড় বড় বিশেষজ্ঞদের তৈরী মেশিনসমূহে প্রথমতঃ কিছু না কিছু দোষ-ত্রুটি থাকে। যদি দোষ-ত্রুটি নাও থাকে, তবুও যত কঠিন ইস্পাতের মেশিন ও কল-কব্জাই হোক না কেন, চলতে চলতে তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং এক সময় ঢিলে হয়ে পড়ে। ফলে মেরামত গ্রেসিং দরকার হয়। এজন্যে কয়েকদিন বরং অনেক সময় কয়েক সপ্তাহ ও কয়েক মাস তা অকেজো পড়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার নির্মিত মেশিনের প্রতি লক্ষ্য করুন, প্রথম দিন যেভাবে এগুলো চালু করা হয়েছিল, আজো তেমনি চালু রয়েছে। এগুলোর গতিতে কখনও এক মিনিট কিংবা এক সেকেন্ডের পার্থক্য হয় না। কখনও এগুলোর কোন কলকব্জা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না এবং কখনও ওয়ার্কশপে পাঠাতে হয় না। কারণ, এগুলো শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র আদেশে চলছে। অর্থাৎ, এগুলো চালানোর জন্য না বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজন হয়, না কোন ইঞ্জিনের সাহায্য নিতে হয়, বরং শুধু আল্লাহ্‌র আদেশের শক্তিবলেই চলছে। এ চলার গতিতে বিন্দুমাত্র পার্থক্য আসাও অসম্ভব। তবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ নিজেই যখন নির্দিষ্ট সময়ে এগুলোকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করবেন, তখন গোটা ব্যবস্থাই তছনছ হয়ে যাবে। আর এরই নাম হল কেয়ামত।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করার পর আল্লাহ্ তা'আলার অসীম ক্ষমতা একটি সামগ্রিক বিধির আকারে বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ – خلق শব্দের অর্থ সৃষ্টি করা এবং امر শব্দের অর্থ আদেশ করা। বাক্যের অর্থ এই যে, সৃষ্টিকর্তা হওয়া এবং আদেশদাতা হওয়া আল্লাহ্‌র জন্যেই নির্দিষ্ট। অন্য কেউ না সামান্যতম বস্তু সৃষ্টি করতে পারে, আর না কাউকে আদেশ করার অধিকার রাখে। তবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কাউকে কোন বিশেষ বিভাগ বা কার্যভার সমর্পণ করা হলে তাও বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলারই আদেশ। তাই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এসব বস্তু সৃষ্টি করাও তাঁরই কাজ এবং সৃষ্টির পর এগুলোকে কর্মে নিয়োগ করাও অন্য কারও সাধ্যের বিষয় নয়; বরং আল্লাহ্ তা'আলারই অসীম শক্তির কারসাজি।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার অসীম শক্তির বহিঃপ্রকাশ এবং গুরুত্বপূর্ণ নেয়ামতসমূহ বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, একমাত্র বিশ্বপালকই যখন অসীম শক্তির অধিকারী এবং যাবতীয় অনুকম্পা ও নেয়ামত প্রদানকারী, তখন বিপদাপদ ও অভাব-অনটনে তাঁকেই ডাকা এবং তাঁর কাছেই দোয়া-প্রার্থনা করা উচিত। তাঁকে ছেড়ে অন্যদিকে মনোনিবেশ করা মূর্খতা এবং বঞ্চিত হওয়ার নামান্তর।

এতদসহ আলোচ্য আয়াতসমূহে দোয়ার কতিপয় আদবও ব্যক্ত করা হয়েছে। এগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখলে দোয়া কবুল হওয়ার আশা বেড়ে যায়।

আরবী ভাষায় دُعَاءٌ (দোয়া) শব্দটির অর্থ দ্বিবিধ – (এক) বিপদাপদ দূরীকরণ ও অভাব পূরণের জন্যে কাউকে ডাকা এবং (দুই) যে কোন অবস্থায় কাউকে স্মরণ করা। এ আয়াতে উভয় অর্থই হতে পারে। বলা হয়েছেঃ ادْعُوا رَبَّكُمْ অর্থাৎ, অভাব পূরণের জন্যে স্বীয় পালনকর্তাকে ডাক অথবা স্মরণ কর এবং পালনকর্তার এবাদত কর।

প্রথমাবস্থায় অর্থ হবে, স্বীয় অভাব-অনটনের সমাধান একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই প্রার্থনা কর। আর দ্বিতীয়াবস্থায় অর্থ হবে, স্মরণ ও এবাদত একমাত্র তাঁরই কর। উভয় তফসীরই পূর্ববর্তী মনীষী ও তফসীরবিদগণের কাছ থেকে বর্ণিত রয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে ঃ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً – تضرع শব্দের অর্থ অক্ষমতা, বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করা এবং خفية শব্দের অর্থ গোপন।

এ শব্দদ্বয়ে দোয়া ও স্মরণের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ আদব বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ অপারকতা ও অক্ষমতা এবং বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে দোয়া করা, তা কবুল হওয়ার জন্য জরুরী শর্ত। দোয়ার ভাষাও অক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। বলার ভঙ্গি এবং দোয়ার আকার-আকৃতিও বিনয় এবং নম্রতাসূচক হওয়া চাই। এতে বোঝা যায় যে, আজকাল জনসাধারণ যে ভঙ্গিতে দোয়া প্রার্থনা করে প্রথমতঃ একে দোয়া-প্রার্থনা বলাই যায় না; বরং দোয়া পড়া বলা উচিত। কেননা, প্রায়ই জানা থাকে না যে, মুখে যেসব শব্দ উচ্চারণ করা হচ্ছে, তার অর্থ কি? আজকাল সাধারণ মসজিদসমূহে এটি ইমামদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তাদের কতিপয় আরবী বাক্য মুখস্থ থাকে এবং নামায শেষে সেগুলোই আবৃত্তি করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বয়ং ইমামদেরও এসব শব্দের অর্থ জানা থাকে না। তাদের জানা থাকলেও মুক্তাদীরা সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে। তারা অর্থ না বুঝেই ইমামের আবৃত্তি করা বাক্যাবলীর সাথে সাথে 'আমীন' 'আমীন' বলতে থাকে। এই আগাগোড়া প্রহসনের সারমর্ম কতিপয় বাক্যের আবৃত্তি ছাড়া কিছুই নয়। দোয়া প্রার্থনার যে স্বরূপ, তা এ ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। এটা ভিন্ন কথা যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কৃপায় এসব নিষ্প্রাণ বাক্যগুলোও কবুল করে নিতে পারেন। কিন্তু একথা বোঝা দরকার যে, দোয়া প্রার্থনা পাঠ করার বিষয় নয়। কাজেই চাওয়ার যথার্থ রীতি অনুযায়ীই চাইতে হবে।

এছাড়া যদি কারও নিজ বাক্যাবলীর অর্থও জানা থাকে এবং তা বুঝেসুঝে বলে, তবে বলার ভঙ্গি এবং বাহ্যিক আকার-আকৃতিতে বিনয় ও নম্রতা ফুটে না উঠলে এ দোয়াও দাবীতে পরিণত হয়, যা করার অধিকার কোন বান্দারই নেই।

মোটকথা, প্রথম শব্দে দোয়ার প্রাণ ব্যক্ত হয়েছে যে, স্বীয় অক্ষমতা, দীনতা, হীনতা এবং বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে আল্লাহ্র কাছে অভাব-অনটন ব্যক্ত করা। দ্বিতীয় শব্দে আরও একটি নির্দেশ রয়েছে যে, চুপিচুপি ও সংগোপনে দোয়া করা উত্তম এবং কবুলের নিকটবর্তী। কারণ, উচ্চৈঃস্বরে দোয়া চাওয়ার মধ্যে প্রথমতঃ বিনয় ও নম্রতা বিদ্যমান থাকা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ এতে রিয়া এবং সুখ্যাতিরও আশঙ্কা রয়েছে। তৃতীয়তঃ এতে প্রকাশ পায় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একথা জানে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা শ্রোতা ও মহাজ্ঞানী, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবই তিনি জানেন এবং সরব ও নীরব সব কথাই তিনি শোনেন। এ কারণেই খয়বর যুদ্ধের সময় দোয়া করতে গিয়ে সাহাবায়ে কেরামের আওয়াজ উচ্চ হয়ে গেলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা কোন বধিরকে অথবা অনুপস্থিতকে ডাকাডাকি করছ না যে, এত জোরে বলতে হবে; বরং একজন শ্রোতা ও নিকটবর্তীকে সম্বোধন করছ— অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলাকে, তাই সজোরে বলা অর্থহীন। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা জনৈক সৎকর্মীর দোয়া উল্লেখ করে বলেন ঃ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا

অর্থাৎ, যখন সে তার পালনকর্তাকে অনুচ্চস্বরে ডাকল। এতে বোঝা যায় যে, অনুচ্চস্বরে দোয়া করা আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দনীয়।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ প্রকাশ্যে ও সজোরে দোয়া করা এবং নীরবে ও অনুচ্চস্বরে দোয়া করা এতদুভয়ের ফযীলত ৭০ ডিগ্রী তফাৎ রয়েছে। পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ অধিকাংশ সময় আল্লাহ্র স্মরণে ও দোয়ায় মশগুল থাকতেন, কিন্তু কেউ তাদের আওয়ায শুনতে পেত না। বরং তাদের দোয়া তাদের ও আল্লাহ্র মধ্যে সীমিত থাকত। তাদের অনেকেই সমগ্র কোরআন মুখস্থ তেলাওয়াত করতেন, কিন্তু অন্য কেউ টেরও পেত না। অনেকেই প্রভূত ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতেন; কিন্তু মানুষের কাছে তা প্রকাশ করে বেড়াতেন না। অনেকেই রাতের বেলায় স্বগৃহে দীর্ঘ সময় নামায পড়তেন; কিন্তু আগন্তুকরা তা বুঝতেই পারত না। হযরত হাসান বসরী আরও বলেন ঃ আমি এমন অনেককে দেখেছি, যারা গোপনে সম্পাদন করার মত কোন এবাদত কখনও প্রকাশ্যে করেননি। দোয়ায় তাঁদের আওয়ায অত্যন্ত অনুচ্চ হত।- (ইবনে কাসীর, মাযহারী)

ইবনে জুরাইজ বলেন ঃ দোয়ায় আওয়াযকে উচ্চ করা এবং শোরগোল করা মকরূহ। আবু বকর জাস্সাস হানাফী আহ্কামুল কোরআন গ্রন্থে বলেন ঃ এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, নীরবে দোয়া করা জোরে দোয়া করার চাইতে উত্তম। হাসান বসরী ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও একথাই বর্ণিত রয়েছে। এ আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, নামাযে সূরা ফাতেহার শেষে 'আমীনও' আস্তে বলা উত্তম। কারণ, এটিও একটি দোয়া।

অভাব-অনটনের ব্যাপারে দোয়া করা সম্পর্কে এ পর্যন্ত বর্ণনা করা হল। আয়াতে যদি দোয়ার অর্থ যিকর ও এবাদত নেয়া হয়, তবে এ সম্পর্কেও পূর্ববর্তী মনীষীদের সুনিশ্চিত অভিমত এই যে, নীরবে যিকর সরব যিকর অপেক্ষা উত্তম। সূফীগণের মধ্যে চিশতিয়া তরীকার বুযুর্গগণ মুরীদকে প্রথম পর্যায়ে সরব যিকর শিক্ষা দেন। তাঁরা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবস্থার প্রতিকার হিসেবে এরূপ করেন, যাতে শব্দের মাধ্যমে অলসতা দূর হয়ে যায় এবং যিকরের সাথে আত্মার সম্পর্ক সৃষ্টি হতে পারে। নতুবা সরব যিকর জায়েয হলেও তা তাঁদের কাম্য নয়। অবশ্য এর বৈধতাও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে, এ বৈধতার জন্যে রিয়া ও সুখ্যাতি অর্জন উদ্দেশ্য না হওয়া শর্ত।

ইমাম আহমদ, ইবনে হাব্বান ও বায়হাকী প্রমুখ হযরত সা'দ ইবনে আবী-ওক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ خير الذكر الخفى وخير الرزق ما يكفى অর্থাৎ, নীরব যিকর উত্তম এবং ঐ রিযিক উত্তম, যা যথেষ্ট হয়ে যায়।

তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এ সময়ে সরব যিকরই কাম্য ও উত্তম। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বীয় উক্তি ও কর্ম দ্বারা এসব অবস্থা ও সময় বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। উদাহরণতঃ আযান ও একামত উচ্চৈঃস্বরে বলা, সরব নামাযসমূহে উচ্চৈঃস্বরে কোরআন তেলাওয়াত করা, নামাজের তকবীর, তশরীকের তকবীর এবং হজ্জে লাব্বাইকা উচ্চৈঃস্বরে বলা ইত্যাদি। এ কারণেই এ সম্পর্কে ফেকাহ্বিদগণের সিদ্ধান্ত এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যেসব বিশেষ অবস্থা ও স্থানে কথা ও কর্মের মাধ্যমে সরব যিকর করার শিক্ষা দিয়েছেন, সেখানে সজোরেই করা উচিত। এছাড়া অন্যান্য অবস্থা ও স্থানে নীরব যিকরই উত্তম ও অধিক উপকারী।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ – معتدين শব্দটি اعتداء থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সীমাঅতিক্রম করা। উদ্দেশ্য এই যে,আল্লাহ্ তাআলা সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না। তা দোয়ায় সীমা অতিক্রম করাই হোক কিংবা অন্য কোন কাজে—কোনটিই আল্লাহ্র পছন্দনীয় নয়। চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সীমা ও শর্তাবলী পালন ও আনুগত্যের নামই ইসলাম। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও অন্যান্য লেনদেনে শরীয়তের সীমা অতিক্রম করলে সেগুলো এবাদতের

পরিবর্তে গোনাহে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

দোয়ায় সীমা অতিক্রম করা কয়েক প্রকারে হতে পারে। (এক) দোয়ায় শাব্দিক লৌকিকতা, ছন্দ ইত্যাদি অবলম্বন করা। এতে বিনয় ও নম্রতা ব্যাহত হয়। (দুই) দোয়ায় অনাবশ্যক শর্ত সংযুক্ত করা। যেমন, বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফফাল (রাঃ) স্বীয় পুত্রকে এভাবে দোয়া করতে দেখলেনঃ হে আল্লাহ্, আমি আপনার কাছে জান্নাতে শুভ্র রঙ্গের ডান দিকস্থ প্রাসাদ প্রার্থনা করি। তিনি পুত্রকে বারণ করে বললেনঃ দোয়ায় এ ধরনের শর্তযুক্ত করা সীমা অতিক্রম। কোরআন ও হাদীসে তা নিষিদ্ধ।—(মাযহারী)

(তিন) সাধারণ মুসলমানদের জন্যে বদ দোয়া করা কিংবা এমন কোন বিষয় কামনা করা যা সাধারণ লোকের জন্যে ক্ষতিকর এবং এমনিভাবে এখানে উল্লেখিত দোয়ায় বিনা প্রয়োজনে আওয়ায উচ্চ করাও এক প্রকার সীমা অতিক্রম।—(তফসীরে মাযহারী, আহকামুল কোরআন)

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছেঃ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا এখানে صلاح ও فساد দু'টি পরস্পর বিরোধী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। صلاح শব্দের অর্থ সংস্কার এবং فساد শব্দের অর্থ অনর্থ ও গোলযোগ। ইমাম রাগেব 'মুফরাদাতুল কোরআন' গ্রন্থে বলেনঃ সমতা থেকে বের হয়ে যাওয়াকেই فساد বলা হয়; তা সামান্য হোক কিংবা বেশী। কম বের হলে কম ফাসাদ এবং বেশী বের হলে বেশী ফাসাদ হবে। افساد শব্দের অর্থ অনর্থ সৃষ্টি করা এবং اصلاح শব্দের অর্থ সংস্কার করা। কাজেই আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না, আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক সংস্কার করার পর।

ইমাম রাগেব বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার সংস্কার কয়েক প্রকার হতে পারে। (এক) প্রথমেই জিনিসটি সঠিকভাবে সৃষ্টি করা। যেমন, বলা হয়েছেঃ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ (দুই) অনর্থ আসার পর তা দূর করা। যেমন, يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ (তিন) সংস্কারের নির্দেশ দান করা। আয়াতে বলা হয়েছে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর সংস্কার সাধন করেছেন, তখন তোমরা তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। এখানে পৃথিবীর সংস্কার সাধন করার দু'টি অর্থ হতে পারে। (এক) বাহ্যিক সংস্কার; অর্থাৎ, পৃথিবীকে চাষাবাদ ও বৃক্ষ রোপণের উপযোগী করেছেন, তাতে মেঘের সাহায্যে পানি বর্ষণ করে মাটি থেকে ফল-ফুল উৎপন্ন করেছেন এবং মানুষ ও অন্যান্য জীব-জন্তুর জন্যে মাটির থেকে জীবন ধারনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন।

(দুই) পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ ও অর্থগত সংস্কার করেছেন। পয়গম্বর, গ্রন্থ, ও হেদায়েত প্রেরণ করে পৃথিবীকে কুফর, শেরক ও পাপাচার থেকে পবিত্র করেছেন। আয়াতে উভয় অর্থ, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সংস্কারও উদ্দিষ্ট হতে পারে। অতএব, আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে পৃথিবীর সংস্কার সাধন করেছেন। এখন তোমরা এতে গোনাহ্ ও অবাধ্যতার মাধ্যমে গোলযোগ ও অনর্থ সৃষ্টি করো না।

ভূপৃষ্ঠের সংস্কার ও অনর্থের মর্ম ঃ সংস্কার যেমন দু'রকমঃ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ, তেমনি অনর্থও দু'রকম। ভূপৃষ্ঠের বাহ্যিক সংস্কার এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা একে এমন এক পদার্থরূপে সৃষ্টি করেছেন, যা পানির মত নরমও নয় যে, তাতে কোন কিছু স্থিতাবস্থা লাভ করতে পারে না এবং পাথরের মত শক্তও নয় যে, খনন করা যাবে না। বরং এক মধ্যবর্তী অবস্থায় রেখেছেন যাতে মানুষ একে চাষাবাদের মাধ্যমে নরম করে নিয়ে বৃক্ষ ও ফল-ফুল উৎপন্ন করতে পারে এবং খনন করে কূপ, পরিখা ও নদীনালা তৈরী করতে পারে ও গৃহের ভিত্তি স্থাপন করতে পারে। এরপর মাটির ভেতরে ও বাইরে আবাদ করার উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, যাতে তরিতরকারী, উদ্ভিদ ও ফলমূল উৎপন্ন হয়। বাইরে বাতাস, আলো, ঠাণ্ডা ও উত্তাপ সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর মেঘমালার মাধ্যমে তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, যার ফলে বৃক্ষ উৎপন্ন হতে পারে। বিভিন্ন নক্ষত্র ও গ্রহপুঞ্জের শীতল ও উত্তপ্ত কিরণ নিক্ষেপ করে ফুল ও ফলে রঙ ও রস ভরে দেয়া হয়েছে। মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি দান করা হয়েছে, যদ্দ্বারা সে মৃত্তিকাজাত কাঁচামাল কাঠ, লোহা, তামা, পিতল, এলোমোনিয়াম ইত্যাদিকে জোড়া দিয়ে শিল্পদ্রব্যের এক নতুন জগত সৃষ্টি করেছে। এগুলো ভূপৃষ্ঠের বাহ্যিক সংস্কার এবং আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অসীম শক্তির বলে তা সাধন করেছেন।

আভ্যন্তরীণ ও আত্মিক সংস্কার হল আল্লাহ্র স্মরণ, আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং তাঁর আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল। এর জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে প্রতিটি মানুষের অন্তরে আনুগত্য ও স্মরণের একটি প্রেরণা নিহিত রেখেছেনঃ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (আল্লাহ্ মানুষকে পাপাচার ও খোদাভীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত করেছেন।) মানুষের চার পাশের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে অসীম শক্তি ও বিস্ময়কর কারিগরির এমন বহিঃপ্রকাশ রেখেছেন, যেগুলো দেখে সামান্য বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিও বলে উঠেঃ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (সমুচ্চ হোন সুন্দরতম স্রষ্টা।) এছাড়া রসূল প্রেরণ করেছেন এবং ধর্মগ্রন্থ নাযিল করেছেন। এভাবে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক স্থাপনের পুরোপুরি ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এভাবে যেন ভূপৃষ্ঠের পরিপূর্ণ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সংস্কার হয়ে গেছে। এখন নির্দেশ দেয়া হচ্ছেঃ আমি এ ভূপৃষ্ঠকে ঠিকঠাক করে দিয়েছি। তোমরা একে নষ্ট করো না।

সংস্কারের যেমন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দু'টি রূপ বর্ণিত হয়েছে, তেমনি এর বিপরীতে ফাসাদ ও অনর্থ সৃষ্টিরও বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দু'টি প্রকার রয়েছে। আলোচ্য আয়াত দ্বারা ফাসাদের উভয় প্রকারই নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আসল ও প্রধান কর্তব্য হচ্ছে আভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধন এবং আভ্যন্তরীণ অনর্থ সৃষ্টিকে প্রতিরোধ করা। কিন্তু এ জগতে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সংস্কার ও ফাসাদের মধ্যে এমন নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে যে, একটির ফাসাদ অন্যটির ফাসাদের কারণ হয়ে যায়। তাই শরীয়ত আভ্যন্তরীণ ফাসাদের দ্বার যেমন রুদ্ধ করেছে, তেমনি বাহ্যিক ফাসাদকেও প্রতিরোধ করেছে। চুরি, ডাকাতি, হত্যা এবং যাবতীয় অশ্লীল কার্যকলাপও জগতে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ফাসাদ সৃষ্টি করে। তাই এসব বিষয়ের উপর বিশেষভাবে নিষেধাজ্ঞা ও কঠোর শাস্তি আরোপ করা হয়েছে এবং সাধারণ অপরাধকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা, প্রত্যেকটি অপরাধ ও পাপ কাজই কোথাও বাহ্যিক ফাসাদ সৃষ্টি করে এবং কোথাও আভ্যন্তরীণ অনর্থের কারণ হয়। চিন্তা করলে দেখা যায়, প্রতিটি বাহ্যিক ফাসাদ আভ্যন্তরীণ ফাসাদের কারণ হয় এবং প্রতিটি আভ্যন্তরীণ ফাসাদ বাহ্যিক ফাসাদ ডেকে আনে।

বাহ্যিক ফাসাদ যে আভ্যন্তরীণ ফাসাদের কারণ হয় তা বলাই বাহুল্য। কারণ, বাহ্যিক ফাসাদ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ।

বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র নাফরমানীরই অপর নাম আভ্যন্তরীণ ফাসাদ। তবে আভ্যন্তরীণ ফাসাদ যে বাহ্যিক ফাসাদ ডেকে আনে, তা বোঝা কিছুটা চিন্তাসাপেক্ষ ব্যাপার। কারণ এ বিশ্বচরাচর ও এর প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ বস্তু আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট এবং তাঁর আজ্ঞাধীন। মানুষ যতদিন আল্লাহ্ তা'আলার আজ্ঞাধীন থাকে, ততদিন এসব বস্তুও মানুষের খাদেম হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে মানুষ যখন আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতা করতে শুরু করে, তখন জগতের প্রত্যেকটি বস্তু অজান্তে ও পরোক্ষভাবে মানুষের অবাধ্য হয়ে উঠে, যা মানুষ বাহ্যতঃ চর্মচক্ষে দেখে না; কিন্তু এসব বস্তুর প্রভাব, বৈশিষ্ট্য, পরিণাম ও উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করলে এর জ্বাজ্বল্যমাণ প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাহ্যতঃ জগতের সব বস্তুই মানুষের ব্যবহারে এসে থাকে। পানি কণ্ঠনালীতে পৌঁছে পিপাসা নিবৃত্ত করতে অস্বীকার করে না। খাদ্য ক্ষুধা দূর করতে বিরত হয় না। পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাসগৃহ শীত-গ্রীষ্মে সুখ সরবরাহ করতে অস্বীকৃত হয় না।

কিন্তু পরিণাম চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এসবের কোন একটি বস্তুও স্বীয় কর্তব্য পুরোপুরি পালন করছে না। কেননা, এসব বস্তু ও এসবের ব্যবহারের আসল উদ্দেশ্য আরাম ও সুখ লাভ করা, অস্থিরতা ও কষ্ট দূর হওয়া এবং অসুখে-বিসুখে রোগমুক্তি অর্জিত হওয়া। অথচ তা হচ্ছে না।

এখন জগতের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন যে, আজকাল আরাম-আয়েশ ও রোগমুক্তি, সাজ-সরঞ্জামের ধারণাতীত প্রাচুর্য সত্ত্বেও মানবগোষ্ঠী অস্থিরতা ও রোগ-ব্যাধির শিকার হচ্ছে। নতুন নতুন রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদ ভিড় জমাচ্ছে। কোন ধনকুবেরই স্বস্থানে নিশ্চিন্ত ও তৃপ্ত নয়। বরং এসব সাজ-সরঞ্জাম যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে হারেই বিপদাপদ, রোগ-ব্যাধি এবং অস্থিরতাও বেড়ে চলছে।

আজ বিদ্যুৎ, বাষ্প ও অন্যান্য বস্তুনিষ্ঠ চাকচিক্যে বিমোহিত মানুষ যদি এসব বস্তুর ঊর্ধ্বে উঠে চিন্তা করে, তবে বোঝা যাবে যে, আমাদের সব প্রচেষ্টা, সব শিল্প ও আবিষ্কারই আমাদের আসল লক্ষ্য অর্থাৎ, সুখ-শান্তি দানে ব্যর্থ হয়েছে। এই আভ্যন্তরীণ কারণ ছাড়া এর অন্য কোন কারণ নেই যে, আমরা স্বীয় প্রতিপালক ও প্রভুর অবাধ্যতার পথ বেছে নিয়েছি। ফলে তাঁর সৃষ্ট বস্তুসমূহও অর্থগতভাবে আমাদের অবাধ্যতা শুরু করেছে।

অর্থাৎ, জগতের এসব বস্তুকে বাহ্যতঃ প্রাণহীন ও চেতনাহীন বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে প্রভুর আজ্ঞাধীন হয়ে কাজ করার উপলব্ধি তাদেরও রয়েছে।

সারকথা, চিন্তা করলে বোঝা যায়, প্রতিটি গোনাহ্ ও আল্লাহ্‌র প্রত্যেকটি অবাধ্যতা দুনিয়াতে শুধু আভ্যন্তরীণ অনর্থই সৃষ্টি করে না, বরং বাহ্যিক অনর্থও এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয়ে থাকে।

এটা কোন কবির কল্পনা নয়, বরং এমন একটি বাস্তব সত্য, কোরআন ও হাদীস যার সাক্ষ্য। শাস্তির হালকা নমুনা এ জগতে রোগ-ব্যাধি, মহামারী, ঝড় ও বন্যার আকারে দেখা দেয়।

তাই وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا বাক্যের অর্থে যেমন জগতে বাহ্যিক ফাসাদ সৃষ্টিকারী গোনাহ্ ও অপরাধসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তেমনি আল্লাহ্ তা'আলার যাবতীয় অবাধ্যতাই এর অন্তর্ভুক্ত। তাই আলোচ্য আয়াতে অতঃপর বলা হয়েছে ঃ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا অর্থাৎ, আল্লাহ্‌কে ভয় ও আশা সহকারে ডাক। অর্থাৎ, একদিকে দোয়া অগ্রাহ্য হওয়ার ভয় থাকবে এবং অপরদিকে তাঁর করুণা লাভের পূর্ণ আশাও থাকবে। এ আশা ও ভয়ই দৃঢ়তার পথে মানবাত্মার দু'টি বাহু। এ বাহুদ্বয়ের সাহায্যে সে ঊর্ধ্বলোকে আরোহণ করে এবং সুউচ্চ পদ মর্যাদা অর্জন করে।

এ বাক্য থেকে বাহ্যতঃ প্রতীয়মান হয় যে, আশা ও ভয় সমান সমান হওয়া উচিত। কোন কোন আলেম বলেন, জীবিতাবস্থায় ও সুস্থতার সময় ভয়কে প্রবল রাখা প্রয়োজন, যাতে আনুগত্যে ত্রুটি না হয়, আর যখন মৃত্যু নিকটবর্তী হয়, তখন আশাকে প্রবল রাখবে। কেননা, এখন কাজ করার শক্তি বিদায় নিয়েছে। করুণা লাভের আশা করাই এখন তার একমাত্র কাজ।- (বাহ্‌রে-মুহীত)

কোন কোন সূক্ষ্মদর্শী আলেম বলেন ঃ ধর্মের বিশুদ্ধ পথে অটল থাকা এবং সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র আনুগত্য করাই প্রকৃত লক্ষ্য। মানুষের মেজাজ ও স্বভাব বিভিন্নরূপ। কেউ ভয়ের প্রবলতার দ্বারা এ লক্ষ্য অর্জন করতে পারে, আবার কেউ মহব্বত ও আশার প্রবলতার দ্বারা। যার জন্যে যে অবস্থা লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হয়, সে তাই হাসিল করতে চেষ্টিত হবে।

মোটকথা, পরবর্তী আয়াতে দোয়ার দু'টি আদব বর্ণিত হয়েছে। (এক) বিনয় ও নম্রতা সহকারে দোয়া করা এবং (দুই) আস্তে ও সংগোপনে দোয়া করা। এ দু'টি গুণই মানুষের বাহ্যিক দেহের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা, বিনয়ের অর্থ হল দোয়ার সময় দৈহিক আকার-আকৃতিকে অপারক ও ফকীরের মত করে নেয়া, অহংকারী ও বেপরওয়ার মত না হওয়া। দোয়া সংগোপনে করার সম্পর্কও মুখ ও জিহবার সাথে যুক্ত।

এ আয়াতে দোয়ার আরও দু'টি আভ্যন্তরীণ আদব বর্ণিত হয়েছে। এ গুলোর সম্পর্ক মানুষের মনের সাথে। আর তা হল এই যে, দোয়াকারীর মনে এ আশঙ্কা থাকা উচিত যে, সম্ভবতঃ দোয়াটি গ্রাহ্য হবে না এবং এ আশাও থাকা উচিত যে, দোয়া কবুল হতে পারে। কেননা, পাপ ও গোনাহ্ থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়াও ঈমানের পরিপন্থী। অপরদিকে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়াও কুফর। এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকলেই দোয়া কবুল হবে বলে আশা করা যায়।

অতঃপর আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার করুণা সৎকর্মীদের নিকটবর্তী। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদিও দোয়ার সময় ভয় ও আশা উভয় অবস্থাই থাকা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে আশার দিকটিই থাকবে প্রবল। কেননা, বিশ্ব প্রতিপালক পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র দান ও অনুগ্রহে কোন ত্রুটি ও কৃপণতা নেই। তিনি মন্দের চেয়ে মন্দ লোক, এমনকি শয়তানের দোয়াও কবুল করতে পারেন। কবুল না হওয়ার আশঙ্কা একমাত্র স্বীয় কুকর্ম ও গোনাহ্‌র অকল্যাণেই থাকতে পারে। কারণ, আল্লাহ্‌র রহমতের নিকটবর্তী হওয়ার জন্যে সৎকর্মী হওয়া প্রয়োজন।

এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ কেউ কেউ সুদীর্ঘ সফর করে, স্বীয় বেশভূষা ফকীরের মত করে এবং আল্লাহ্‌র সামনে দোয়ার হস্ত প্রসারিত করে; কিন্তু তাদের খাদ্য, পানীয় ও পোশাক সবই হারাম- এরূপ লোকের দোয়া কিরূপে কবুল হতে পারে? - (মুসলিম, তিরমিযী)

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ বান্দা যতক্ষণ কোন গোনাহ অথবা আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদের দোয়া না করে এবং তড়িঘড়ি না করে, ততক্ষণ তার দোয়া কবুল হতে থাকে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَالَّذِىْ خَبُثَ
لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا ۚ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ ﴿٥٨﴾
لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا
لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۚ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٥٩﴾
قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖٓ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٦٠﴾ قَالَ
يٰقَوْمِ لَيْسَ بِىْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦١﴾
اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٢﴾
اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ
لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٦٣﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ
وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ
اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ ﴿٦٤﴾ وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ۚ قَالَ
يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۚ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٦٥﴾
قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖٓ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِىْ
سَفَاهَةٍ وَّاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦٦﴾ قَالَ يٰقَوْمِ
لَيْسَ بِىْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٧﴾

(৫৮) যে শহর উৎকৃষ্ট, তার ফসল তার প্রতিপালকের নির্দেশে উৎপন্ন হয় এবং যা নিকৃষ্ট তাতে অল্পই ফসল উৎপন্ন হয়। এমনিভাবে আমি আয়াতসমূহ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বর্ণনা করি কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্যে। (৫৯) নিশ্চয় আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠিয়েছি। সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্যে একটি মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি। (৬০) তার সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল ঃ আমরা তোমাকে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মাঝে দেখতে পাচ্ছি। (৬১) সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, আমি কখনও ভ্রান্ত নই; কিন্তু আমি বিশ্বপ্রতিপালকের রসূল। (৬২) তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছাই এবং তোমাদেরকে সদুপদেশ দেই। আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমনসব বিষয় জানি, যেগুলো তোমরা জান না। (৬৩) তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্য থেকেই একজনের বাচনিক উপদেশ এসেছে— যাতে সে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে, যেন তোমরা সংযত হও এবং যেন তোমরা অনুগৃহীত হও। (৬৪) অতঃপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। আমি তাকে এবং নৌকাস্থিত লোকদেরকে উদ্ধার করলাম এবং যারা মিথ্যারোপ করত, তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। নিশ্চয় তারা ছিল অন্ধ। (৬৫) আদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই হূদকে। সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। (৬৬) তার সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল ঃ আমরা তোমাকে নির্বোধ দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। (৬৭) সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, আমি মোটেই নির্বোধ নই, বরং আমি বিশ্ব প্রতিপালকের প্রেরিত পয়গম্বর।

তড়িঘড়ি দোয়া করার অর্থ কি? তিনি বললেন ঃ এর অর্থ হল এরূপ ধারণা করে বসা যে, আমি এত দীর্ঘ দিন থেকে দোয়া করছি, অথচ এখনো পর্যন্ত কবুল হল না! অতঃপর নিরাশ হয়ে দোয়া ত্যাগ করা। – (মুসলিম, তিরমিযী)

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যখনই আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করবে, তখনই কবুল হওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়ে দোয়া করবে।

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র রহমতের বিস্তৃতিকে সামনে রেখে দোয়া করলে অবশ্যই দোয়া কবুল হবে বলে মনকে মজবুত কর। এমন মনে কর, গোনাহ্‌র কারণে দোয়া কবুল না হওয়ার আশঙ্কা অনুভব করা এর পরিপন্থী নয়।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ ও বড় নেয়ামতসমূহ উল্লেখ করেছিলেন। নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল, দিবারাত্র, চন্দ্র-সূর্য সাধারণ নক্ষত্রমণ্ডলীর সৃষ্টি ও মানুষের প্রয়োজনাদি সরবরাহে এবং সেবায় এগুলোর নিয়োজিত থাকার কথা উল্লেখ করে এ ব্যাপারে হুঁশিয়ার করেছিলেন যে, যখন এক পবিত্র সত্তাই যাবতীয় প্রয়োজন ও সুখ-শান্তির উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, তখন যে কোন অভাব-অনটন ও প্রয়োজনে তাঁর কাছেই দোয়া প্রার্থনা করা উচিত এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকেই সাফল্যের চাবিকাঠি বলে মনে করা কর্তব্য।

আলোচ্য প্রথম আয়াতেও এমনি ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ও বড় নেয়ামত উল্লেখিত হয়েছে। এসব নেয়ামতের উপরই মানুষ ও পৃথিবীর সব সৃষ্টজীবের জীবন ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। উদাহরণতঃ বৃষ্টি এবং তদ্দ্বারা উৎপন্ন বৃক্ষ, ফসলাদি তরিতরকারী ইত্যাদি। পার্থক্য এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ঊর্ধ্বজগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত নেয়ামতসমূহ বর্ণিত হয়েছিল এবং আলোচ্য আয়াতে নিম্নজগতের সাথে সম্পর্কশীল নেয়ামতসমূহ বর্ণিত হচ্ছে।– (বাহ্‌রে-মুহীত)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ

৫৮ নং আয়াতে বিশেষভাবে একথা বলা হয়েছে যে, আমার এসব বিরাট নেয়ামত যদিও ভূখণ্ডের সর্বত্র ব্যাপক; বৃষ্টি বর্ষিত হলে যদিও পাহাড়, সমুদ্র, উর্বর, অনুর্বর এবং উত্তম ও অনুত্তম সব রকম ভূখণ্ডেই সমভাবে বর্ষিত হয়, কিন্তু ফসল, বৃক্ষ ও তরিতরকারী একমাত্র এমন ভূখণ্ডেই উৎপন্ন হয়, যাতে উর্বরতা রয়েছে— কঙ্কর ও বালুকাময় ভূখণ্ড এ বৃষ্টির দ্বারা উপকৃত হয় না।

প্রথম আয়াতের ফলাফল ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যে পবিত্র সত্তা মৃত ভূখণ্ডে ফসল উৎপাদনের মত জীবনীশক্তি দান করেন, তাঁর পক্ষে যে মানুষ পূর্বে জীবিত ছিল অতঃপর মারা যায়, তার মধ্যে পুনরায় জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি করে দেয়া মোটেই কঠিন নয়। এ ফলাফলটি আয়াতে স্পষ্টরূপে বিবৃত হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াত থেকে এরূপ ফলাফল বের করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র হেদায়েত, ঐশী গ্রন্থসমূহ, আম্বিয়া (আঃ), তাঁদের প্রতিনিধি আলেম ও মাশায়েখের শিক্ষাও বৃষ্টির মত সবার জন্যেই ব্যাপক; কিন্তু বৃষ্টি দ্বারা যেমন সব ভূখণ্ডই উপকৃত হয় না তেমনি এ আধ্যাত্মিক বৃষ্টির উপকারও তারাই লাভ করে, যাদের মধ্যে যোগ্যতা রয়েছে। পক্ষান্তরে যাদের অন্তর কঙ্করময় কিংবা বালুকাময় ভূখণ্ডের মত উৎপাদনের যোগ্যতা বিবর্জিত, তারা যাবতীয় সুস্পষ্ট নিদর্শন সত্ত্বেও স্বীয় পথভ্রষ্টতায় অটল থাকে। এ ফলাফলের দিকেই দ্বিতীয় আয়াতের শেষ বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে। كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ অর্থাৎ,

আমি এমনিভাবে স্বীয় প্রমাণাদি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বর্ণনা করি তাদের জন্যে যারা এর মূল্য দেয়। উদ্দেশ্য এই যে, বাস্তবে যদিও এ বর্ণনা সবার জন্যেই ব্যাপক; কিন্তু পরিণতির দিক দিয়ে তাদের জন্যেই উপকারী প্রমাণিত হয়েছে যারা যোগ্যতাসম্পন্ন এবং যারা এর মূল্য ও মর্যাদা বোঝে। এভাবে উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ে ইহকাল ও পরকালের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এবার উভয় আয়াতের বিস্তারিত বর্ণনা শুনুন। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَهُوَ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ – এতে ريح শব্দটি ريح – এর বহুবচন। এর অর্থ বায়ু, بُشْرًا শব্দের অর্থ সুসংবাদ। এবং রহমত বলে বৃষ্টির রহমত বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলাই বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদ দেয়ার জন্যে বায়ু প্রেরণ করেন।

উদ্দেশ্য এই যে, বৃষ্টির পূর্বে ঠাণ্ডা বায়ু প্রেরণ করা আল্লাহ্র চিরন্তন রীতি। এ বাতাস দ্বারা স্বয়ং মানুষ আরাম ও প্রফুল্লতা অর্জন করে এবং তা যেন ভাবী বৃষ্টির সংবাদও পূর্বাহ্নে প্রদান করে। অতএব, এ বায়ু দু'টি নেয়ামতের সমষ্টি। (এক) স্বয়ং মানুষ ও সাধারণ সৃষ্টজীবের জন্যে উপকারী এবং (দুই) বৃষ্টির পূর্বে বৃষ্টির আগমনবার্তা বহনকারী। কেননা, মানুষ একটি নরম ও নাজুক সৃষ্টি; তার অনেক প্রয়োজনীয় কাজ বৃষ্টির কারণে বন্ধ হয়ে যায়। বৃষ্টির সংবাদ পূর্বে পেয়ে সে নিজের ব্যবস্থা সম্পন্ন করে নেয়। এছাড়া স্বয়ং তার অস্তিত্ব এবং তার আসবাবপত্র ও নিজের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করে নেয়।

এরপর বলা হয়েছে ঃ حَتّٰى اِذَآ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا – سحاب শব্দের অর্থ মেঘ এবং ثقال শব্দটি ثقيل – এর বহুবচন। এর অর্থ ভারী। অর্থাৎ, বায়ু যখন ভারী মেঘমালাকে উপরে উঠিয়ে নেয়। ভারী মেঘমালার অর্থ পানিতে ভরপুর মেঘমালা — যা বাতাসের কাঁধে সওয়ার হয়ে উপরে উঠে যায়। এভাবে হাজারো মণ ভারী পানি বাতাসে ভর করে উপরে পৌঁছে যায়। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এতে কোন মেশিন কাজ করে না এবং কোন মানুষও শ্রম নিয়োগ করে না। আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম হওয়া মাত্র আপনা-আপনি সমুদ্র থেকে বাষ্প (মৌসুমী বায়ু) উত্থিত হতে থাকে এবং উপরে উঠে মেঘমালার আকার ধারণ করে। অতঃপর হাজারো বরং লাখো গ্যালন পানিভর্তি এ জাহাজ বাতাসের কাঁধে সওয়ার হয়ে আকাশ পানে ধাবিত হয়।

এরপর বলা হয়েছে ঃ سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ – سوق – এর অর্থ কোন জন্তুকে হাঁকানো ও চালানো, بلد এর অর্থ শহর, বস্তি ও জনপদ। আর ميت – এর অর্থ মৃত।

অর্থাৎ, বাতাস যখন ভারী মেঘমালাকে তুলে নেয়, তখন আমি মেঘমালাকে কোন মৃত শহরের দিকে পরিচালিত করি। মৃত শহর বলে এমন জনপদকে বোঝানো হয়েছে, যা পানির অভাবে উজাড়প্রায়। এখানে সাধারণ ভূখণ্ডের পরিবর্তে বিশেষভাবে শহর উল্লেখ করা এ জন্যে সমীচীন হয়েছে যে, বৃষ্টি-বাদল প্রেরণ ও মাটিকে সিক্ত করার প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের প্রয়োজন মেটানো। মানুষের বাসস্থান হচ্ছে শহর। নতুবা বন-জঙ্গলের সজীবতা স্বয়ং কোন লক্ষ্য নয়।

এ পর্যন্ত আলোচ্য আয়াতের বিষয়-বস্তুর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রমাণিত হল। প্রথমতঃ বৃষ্টি মেঘমালা থেকে বর্ষিত হয়। এতে বোঝা গেল যে, যেসব আয়াতে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের কথা বলা হয়েছে, সেখানেও 'সামা' (আকাশ) শব্দ দ্বারা মেঘমালাকেই বোঝানো হয়েছে। কোন সময় সামুদ্রিক মৌসুমী বায়ুর পরিবর্তে সরাসরি আকাশ থেকে মেঘমালা সৃষ্টি হয়ে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত ঃ কোন বিশেষ দিক কিংবা বিশেষ ভূখণ্ডের দিকে মেঘমালা ধাবিত হওয়া সরাসরি আল্লাহ্র নির্দেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তিনি যখন যেখানে ইচ্ছা এবং যে পরিমাণ ইচ্ছা বৃষ্টি বর্ষণের নির্দেশ দান করেন। মেঘমালা আল্লাহ্র সে নির্দেশই পালন করে মাত্র।

এ বিষয়টি সর্বত্রই এভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় যে, মাঝে মাঝে কোন শহর অথবা জনপদের উপর মেঘমালা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে এবং সেখানে বৃষ্টির প্রয়োজনও থাকে, কিন্তু মেঘমালা সেখানে এক ফোঁটা পানিও দেয় না; বরং আল্লাহ্র নির্দেশে যে শহর বা জনপদের প্রাপ্য নির্ধারিত থাকে, সেখানে পৌঁছেই বর্ষিত হয়। নির্দিষ্ট শহর ছাড়া অন্যত্র মেঘের পানি লাভ করার সাধ্য কারো নেই।

প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকগণ মৌসুমী বায়ুর গতিপথ নির্ণয়ের জন্যে কিছু কিছু বিধি ও মূলনীতি আবিষ্কার করে রেখেছেন। এসবের মাধ্যমে তারা বলে দেন যে, অমুক সাগর থেকে যে মৌসুমী বায়ু উত্থিত হয়েছে, তা কোন্ দিকে প্রবাহিত হবে, কোথায় বৃষ্টি বর্ষণ করবে এবং কতটুকু বৃষ্টিপাত হবে। বিভিন্ন দেশে এ ধরনের তথ্য পরিবেশন করার জন্যে আবহাওয়া বিভাগ কায়েম করা হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, আবহাওয়া বিভাগ প্রদত্ত খবরাদি প্রচুর পরিমাণে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। খোদায়ী নির্দেশ তাদের বিপরীতে বলে তাদের সব নিয়ম-কানুনই অকেজো হয়ে যায় এবং মৌসুমী বায়ু তাদের প্রদত্ত খবরের বিপরীতে অন্য কোন দিকে গতি পরিবর্তন করে চলে যায়। ফলে আবহাওয়া বিভাগের নিষ্ফল তাকিয়ে থাকাই সার হয়।

এছাড়া বায়ুর গতিপ্রবাহ নির্ণয়ের জন্যে বৈজ্ঞানিকদের উদ্ভাবিত নীতিমালাও মেঘমালা যে আল্লাহ্ তা'আলার আজ্ঞাধীন— এ বিষয়ের পরিপন্থী নয়। কেননা, বিশ্ব চরাচরের সব কাজ-কারবারে আল্লাহ্র চিরন্তন রীতি এই যে, আল্লাহ্র নির্দেশ স্বাভাবিক কারণসমূহের আবরণ ভেদ করে প্রকাশ পায়। এসব স্বাভাবিক কারণদৃষ্টেই মানুষ নীতিমালা প্রণয়ন করে।

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ অর্থাৎ, আমি মৃত শহরে পানি বর্ষণ করি, অতঃপর পানি দ্বারা সব রকম ফল-মূল উৎপন্ন করি।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

অর্থাৎ, এভাবেই আমি মৃতদেরকে কেয়ামতের দিন উত্থিত করব যাতে তোমরা বোঝ। উদ্দেশ্য এই যে, আমি যেভাবে মৃত ভূখণ্ডকে জীবিত করি এবং তা থেকে বৃক্ষ ও ফল-মূল নির্গত করি, তেমনিভাবে কেয়ামতের দিন মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করে তুলব। আমি এসব দৃষ্টান্ত এজন্যে বর্ণনা করি, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পাও।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ কেয়ামতে দু'বার শিঙ্গা ফুঁকা হবে। প্রথম ফুৎকারের পর সারা বিশ্ব ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে, কোনকিছুই জীবিত থাকবে না। দ্বিতীয় ফুৎকারের পর নতুনভাবে সারা বিশ্ব সৃজিত হবে এবং সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। হাদীসে আরও বলা হয়েছে যে, উভয়বার শিঙ্গা ফুৎকারের মাঝখানে চল্লিশ বছরের ব্যবধান হবে। এ চল্লিশ বছর পর্যন্ত অবিরাম বৃষ্টিপাত হতে থাকবে। এ সময়ের মধ্যেই প্রতিটি মৃত মানুষ ও জন্তুর দেহের অংশ একত্রিত করে পূর্ণ কাঠামো তৈরী করা হবে। অতঃপর শিঙ্গা ফুঁকার সাথে সাথে এসব মৃতদেহে আত্মা এসে যাবে এবং জীবিত হয়ে দণ্ডায়মান হবে। এ রেওয়ায়োতের বেশীর ভাগ বোখারী ও মুসলিম থেকে

এবং কিছু অংশ আবু দাউদের কিতাবুল বা'ছ থেকে গৃহীত হয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا – نكد শব্দের অর্থ ঐ বস্তু, যা অনর্থক এবং সামান্য। অর্থাৎ, বৃষ্টির কল্যাণধারা যদিও প্রত্যেক শহর ও ভূখণ্ডে সমভাবে বর্ষিত হয়, কিন্তু ফলাফলের দিক দিয়ে ভূখণ্ড দু'প্রকার হয়ে থাকে। (এক) উর্বর ও ভাল— যাতে উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে। এ ধরনের ভূখণ্ড থেকে সর্বপ্রকার ফল-মূল উৎপন্ন হয়। (দুই) শক্ত ও লবণাক্ত ভূখণ্ড। এতে উৎপাদনের যোগ্যতা নেই। এরূপ ভূখণ্ডে একে তো কিছু উৎপন্নই হয় না, আর কিছু হলেও খুব অল্প পরিমাণে হয়। যা উৎপন্ন হয় তাও অকেজো ও নষ্ট হয়ে থাকে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ অর্থাৎ, আমি স্বীয় শক্তির প্রমাণাদি নানাভাবে বর্ণনা করি তাদের জন্যে, যারা এগুলোর মর্যাদা দেয়।

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বৃষ্টির কল্যাণধারার মত খোদায়ী হেদায়েত ও নিদর্শনাবলীর কল্যাণও সব মানুষের জন্যে ব্যাপক; কিন্তু প্রতিটি ভূখন্ডই যেমন বৃষ্টি থেকে উপকার লাভ করে না, তেমনি প্রতিটি মানুষই এ হেদায়েত থেকে ফায়দা হাসিল করে না; বরং একমাত্র তারাই ফায়দা হাসিল করে, যারা কৃতজ্ঞ ও এর মর্যাদাদা করে থাকে।

আলোচ্য আয়াতসমূহ সূরা আরাফের পূর্ণ অষ্টম রুকূ। এতে হযরত নূহ (আঃ) এর উম্মতের অবস্থা ও তাদের সংলাপের বিবরণ রয়েছে। নবীদের পরম্পরায় হযরত আদম (আঃ) যদিও সর্বপ্রথম নবী, কিন্তু তাঁর আমলে ঈমানের সাথে কুফর ও গোমরাহীর মোকাবেলা ছিল না। তাঁর শরীয়তের অধিকাংশ বিধানই পৃথিবী আবাদকরণ ও মানবীয় প্রয়োজনাদির সাথে সম্পৃক্ত ছিল। কুফর ও কাফেরদের কোথাও অস্তিত্ব ছিল না। কুফর ও শেরেকের সাথে ঈমানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হযরত নূহ (আঃ)-এর আমল থেকেই শুরু হয়। রেসালত ও শরীয়তের দিক দিয়ে তিনিই জগতের প্রথম রসূল। এছাড়া তুফানে সমগ্র বিশ্ব নিমজ্জিত হওয়ার পর যারা প্রাণে বেঁচে ছিল, তারা ছিল হযরত নূহ (আঃ) ও তাঁর নৌকাস্থিত সঙ্গী-সাথী। তাদের দ্বারাই পৃথিবী নতুনভাবে আবাদ হয়। একারণেই তাঁকে 'ছোট আদম' বলা হয়। বলাবাহুল্য, একারণেই পয়গম্বরদের কাহিনীর সূচনা তাঁর দ্বারাই করা হয়েছে। এই কাহিনীতে সাড়ে নয় শ' বছরের সুদীর্ঘ আয়ুকালে তাঁর পয়গম্বরসুলভ চেষ্টা-চরিত্র, অধিকাংশ উম্মতের বিরুদ্ধাচরণ এবং এর পরিণতিতে গুটিকতক ঈমানদার ছাড়া অবশিষ্ট সবার প্লাবনে নিমজ্জিত হওয়ার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এর বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ

নূহ (আঃ) হযরত আদমের অষ্টম পুরুষ। মুস্তাদরাকে হাকেমে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, আদম (আঃ) ও নূহ (আঃ)-এর মাঝখানে দশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে। এ বিষয়বস্তুই তিবরানী আবু যর (রাঃ)- এর বাচনিক রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। – (তফসীরে মাযহারী) একশ' বছরে এক শতাব্দী হয়। তাই এ রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাঁদের উভয়ের মাঝে এক হাজার বছরের ব্যবধান হয়ে যায়। ইবনে জরীর বর্ণনা করেন যে, নূহ (আঃ)-এর জন্ম হযরত আদম (আঃ)-এর জন্মের আটশ' ছাব্বিশ বছর পর হয়েছিল। আর কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর বয়স হয়েছিল নয়শ' পঞ্চাশ বছর। আদম (আঃ)-এর বয়স সম্পর্কে এক হাদীসে চল্লিশ কম এক হাজার বছর বলা হয়েছে। এভাবে আদম (আঃ)-এর জন্ম থেকে নূহ্ (আঃ)-এর ওফাত পর্যন্ত মোট দু'হাজার আটশ' ছাপ্পান্ন বছর হয়। – (মাযহারী) নূহ (আঃ)-এর আসল নাম 'শাকের'। কোন কোন রেওয়ায়েতে 'সাকান' এবং কোন কোন রেওয়ায়েতে আব্দুল গাফ্ফার বর্ণিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, তাঁর যুগটি হযরত ইদরীস (আঃ)-এর পূর্বে ছিল, না পরে? অধিকাংশ সাহাবীর মতে তিনি পূর্বে ছিলেন।— (বাহ্‌রে-মুহীত)

মুস্তাদরাকে হাকেমে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ নূহ্ (আঃ) চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্ত হন এবং প্লাবনের পর ষাট বছর জীবিত থাকেন।

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নূহ্ (আঃ) শুধু স্বজাতিরই জন্যে নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি সমগ্র বিশ্বের নবী ছিলেন না। তাঁর সম্প্রদায় ইরাকে বসবাসকারী ছিল এবং বাহ্যতঃ সভ্য হলেও শেরকে লিপ্ত ছিল। তিনি তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে একথা বলেন ঃ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্ তাআলার এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্যে একটি মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি। এর প্রথম বাক্যে আল্লাহ্‌র এবাদতের প্রতি দাওয়াত রয়েছে। এটাই সব নীতির মূলনীতি। দ্বিতীয় বাক্যে শেরক ও কুফর থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এটি এ সম্প্রদায়ের মধ্যে মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। তৃতীয় বাক্যে ঐ মহাশাস্তির আশঙ্কা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে, যা বিরুদ্ধাচরণের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এর অর্থ পরকালের মহাশাস্তিও হতে পারে এবং জগতে প্লাবনের শাস্তিও হতে পারে। (কবীর) তাঁর সম্প্রদায় উত্তরে বলল ঃ

قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ – ملأ – শব্দের অর্থ সম্প্রদায়ের সর্দার ও সমাজের মোড়ল। উদ্দেশ্য এই যে, হযরত নূহ্ (আঃ)-এর দাওয়াতের জওয়াবে সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল ঃ আমরা মনে করি যে, আপনি প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে পতিত রয়েছেন। কারণ, আপনি আমাদেরকে বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করতে বলছেন। কেয়ামতে পুনরায় জীবিত হওয়া, প্রতিদান ও শাস্তি ইত্যাদি কুসংস্কার বৈ নয়।

এহেন পীড়াদায়ক ও মর্মন্তুদ কথাবার্তার জওয়াবে নূহ্ (আঃ) পয়গম্বরসুলভ ভাষায় যা বললেন, তা প্রচারক ও সংস্কারনেদের জন্যে একটি উজ্জ্বল শিক্ষা ও হেদায়েত। উত্তেজনার স্থলে উত্তেজিত ও ক্রোধান্বিত হওয়ার পরিবর্তে তিনি সাদাসিধা ভাষায় তাদের সন্দেহ নিরসনে প্রবৃত্ত হলেন। বললেন ঃ

قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ - أُبَلِّغُكُمْ
رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়, আমার মধ্যে কোন পথভ্রষ্টতা নেই। তবে আমি তোমাদের ন্যায় পৈতৃক ধর্মের অনুসারী নই, বরং বিশ্ব পালনকর্তার পক্ষ থেকে পয়গম্বর। আমি যাকিছু বলি, পালনকর্তার নির্দেশেই বলি এবং আল্লাহ্ তাআলার পয়গামই তোমাদের কাছে পৌঁছাই। এতে তোমাদেরই মঙ্গল। এতে না আল্লাহ্‌র কোন লাভ আছে এবং না আমার

কোন স্বার্থ আছে। এখানে رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ 'বিশ্ব পালনকর্তা' শব্দটি শেরকের মূলে কুঠারাঘাতস্বরূপ।

এ সম্পর্কে চিন্তা করলে কোন দেব-দেবী-ইয়াযদাঁ ও আহরেমানই টিকতে পারে না। এরপর বলেছেনঃ কেয়ামতের শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের যে সন্দেহ -এর কারণ তোমাদের অজ্ঞতা। আমাকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান দান করা হয়েছে।

এরপর তাদের দ্বিতীয় সন্দেহের উত্তর দেয়া হয়েছে, যা সূরা মুমিনূনে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত রয়েছেঃ

مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ
لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً

অর্থাৎ, নূহ্ (আঃ)-এর দাওয়াত শোনে তাঁর কওম এমনও সন্দেহ করল যে, সে তো আমাদেরই মত একজন মানুষ, আমাদেরই মত পানাহার করে এবং নিদ্রিত ও জাগ্রত হয়, তাঁকে আমরা কিরূপে অনুসৃত মেনে নিতে পারি? আল্লাহ্ তাআলা যদি আমাদের কাছে কোন পয়গাম পাঠাতে চাইতেন, তবে ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ করতেন। তাদের স্বাতন্ত্র্য ও মাহাত্ম্য আমাদের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট হত। এবং এছাড়া আর কোন কিছু নয় যে, আমাদের গোত্রেরই এক ব্যক্তি আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

এর উত্তরে তিনি বললেনঃ

اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ
وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ অর্থাৎ, তোমরা কি এ ব্যাপারে বিস্মিত যে, তোমাদের পালনকর্তার পয়গাম তোমাদেরই মধ্যে থেকে একজনের মাধ্যমে তোমাদের কাছে এসেছে, যাতে সে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে, যাতে তোমরা ভীত হও এবং যাতে তোমরা অনুগৃহীত হও। অর্থাৎ, তাঁর ভয় প্রদর্শনের ফলে তোমরা হুশিয়ার হয়ে বিরুদ্ধাচরণ ত্যাগ কর, যার ফলে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ নাযিল হয়।

উদ্দেশ্য এই যে, মানুষকে রসূল করা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। প্রথমতঃ আল্লাহ্ তাআলা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। তিনি যাকে ইচ্ছা রেসালত দান করবেন। এতে কারও টু শব্দটি করার অধিকার নেই। এছাড়া আসল ব্যাপারে চিন্তা করলেও বোঝা যায় যে, সাধারণ মানুষের প্রতি রেসালতের উদ্দেশ্য মানুষের মাধ্যমেই পূর্ণ হতে পারে। ফেরেশতাদের দ্বারা এ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না।

কারণ, রেসালতের আসল লক্ষ্য হচ্ছে মানব জাতিকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও এবাদতে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাঁর নির্দেশাবলীর বিরোধিতা থেকে রক্ষা করা। এটা তখনই সম্ভব, যখন মানুষের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তি আদর্শ হয়ে তাদেরকে দেখিয়ে দেয় যে, মানবিক কামনা-বাসনার সাথেও আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও এবাদত একত্রিত হতে পারে। ফেরেশতা এ দাওয়াত নিয়ে আসলে এবং নিজের দৃষ্টান্ত মানুষের সামনে তুলে ধরলে মানুষের প্রকাশ্য আপত্তি থেকে যেত যে, ফেরেশতারা মানবিক প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত—তাদের ক্ষুধা - তৃষ্ণা এবং নিদ্রা ও শ্রান্তি কিছুই নেই- আমরা তাদের মত হব কেমন করে? কিন্তু নিজেদেরই এক ব্যক্তি যখন সব মানবিক প্রবৃত্তি ও বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও খোদায়ী নির্দেশাবলীর পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করবে, তখন তাদের কোন অজুহাত থাকতে পারবে না।

এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যেই বলা হয়েছেঃ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا অর্থাৎ, মানুষ ও মানবিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তির ভয় প্রদর্শনে প্রভাবান্বিত হয়েই মানুষ ভীত হতে পারে- কারো ভয় প্রদর্শনে নয়। অধিকাংশ উম্মতের কাফেররা এ সন্দেহ উত্থাপন করেছে যে, কোন মানুষের নবী ও রসূল হওয়া উচিৎ নয়। কোরআন পাক সবাইকে এ উত্তরই দিয়েছে। পরিতাপের বিষয় যে, কোরআনের এতসব বর্ণনা সত্ত্বেও আজও কিছু লোক রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মানবত্ব অস্বীকার করার দুঃসাহস করে। কিন্তু মূর্খরা এ সত্যটি বোঝে না। তারা কোন স্বজাতীয় ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত নয়। এ কারণেই মূর্খরা সব সময়ই সমসাময়িক ওলী ও আলেমদের প্রতি সমসাময়িকতার কারণে ঘৃণা ও বিমুখতা পোষণ করে এসেছে।

স্বজাতির মর্মন্তুদ কথাবার্তার জওয়াবে নূহ্ (আঃ)-এর দয়ার্দ্র এবং শুভেচ্ছামূলক আচরণও চেতনাহীন জাতির মধ্যে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। তারা অন্ধভাবে মিথ্যারোপেই ব্যাপৃত রইল। তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদের প্রতি প্লাবনের শাস্তি প্রেরণ করলেন। বলা হয়েছেঃ

فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا

بِاٰيٰتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ — অর্থাৎ, নূহ্ (আঃ)-এর জালেম সম্প্রদায় তাঁর উপদেশ ও শুভেচ্ছার পরোয়া করল না এবং যথারীতি মিথ্যারোপে অটল রইল। এর পরিণতিতে আমি নূহ্ (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে একটি নৌকায় উঠিয়ে মুক্তি দিয়েছি এবং যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলেছিল, তাদেরকে নিমজ্জিত করে দিয়েছি। নিশ্চয় তারা ছিল অন্ধ।

হযরত নূহ্ (আঃ)-এর কাহিনী, তাঁর সম্প্রদায়ের সলিল সমাধি লাভ এবং নৌকারোহীদের মুক্তির পূর্ণ বিবরণ সূরা নূহ ও সূরা হূদে বর্ণিত হবে। এস্থলে আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মোটামুটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম বলেনঃ যে সময় নূহ্ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্লাবনের আযাব নেমে এসেছিল, তখন তারা জনসংখ্যা ও শক্তির দিক দিয়ে ভরপুর ছিল। সংখ্যাধিক্যের কারণে ইরাকের ভূখণ্ড এবং পাহাড়েও তাদের সংকুলান হচ্ছিল না। আল্লাহ্ তাআলার চিরন্তন নীতি এই যে, তিনি অবাধ্য জাতিদেরকে ঢিল দেন। তারা যখন সংখ্যাধিক্য, শক্তি ও ধনাঢ্যতার চরম সীমায় উপনীত হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, তখনই তাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব নেমে আসে।—(ইবনে কাসীর)

নূহ্ (আঃ)-এর সাথে নৌকায় কতজন লোক ছিল, এ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। ইবনে কাসীর ইবনে আবী হাতেমের রেওয়ায়েতক্রমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আশি জন লোক ছিল। তন্মধ্যে একজনের নাম ছিল জুরহাম। সে আরবী ভাষায় কথা বলত।—(ইবনে-কাসীর)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, আশি জনের মধ্যে চল্লিশ জন পুরুষ ও চল্লিশ জন মহিলা ছিল। প্লাবনের পর তারা মোসেলের যে স্থানটিতে বসতি স্থাপন করেন, তা 'ছামানুন' (অর্থাৎ, আশি) নামে খ্যাত হয়ে যায়।

মোটকথা, এখানে নূহ্ (আঃ)-এর সংক্ষিপ্ত কাহিনী বর্ণনা করে কয়েকটি বিষয় ব্যক্ত করা হয়েছে। (এক) পূর্বতন সব পয়গম্বরের দাওয়াত ও বিশ্বাসের মূলনীতি ছিল অভিন্ন। (দুই) আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় পয়গম্বরদের সাহায্য ও সমর্থন কিরূপ বিস্ময়কর পন্থায় করেন যে পাহাড়ের সুউচ্চ শৃঙ্গে পর্যন্ত প্লাবনের মধ্যেও তাঁদের নিরাপত্তা ব্যাহত

হয়নি। (তিন) পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করা আল্লাহ্র আযাব ডেকে আনারই নামান্তর। পূর্ববর্তী উম্মতরা যেমন পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করার কারণে আযাবে গ্রেফতার হয়েছে, একালের লোকদেরও এ থেকে ভয়মুক্ত হওয়া উচিত নয়।

আদ ও সামূদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ 'আদ' প্রকৃতপক্ষে নূহ (আঃ)-এর পঞ্চম পুরুষের মধ্যে এবং তাঁর পুত্র সামের বংশধরেরই এক ব্যক্তির নাম। অতঃপর তার বংশধর ও গোটা সম্প্রদায় 'আদ' নামে খ্যাত হয়ে গেছে। কোরআন পাকে আদের সাথে কোথাও 'আদে উলা' (প্রথম আদ) এবং কোথাও إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, আদ সম্প্রদাকে 'ইরাম'ও বলা হয় এবং প্রথম আদের বিপরীতে কোন দ্বিতীয় আদও রয়েছে। এ সম্পর্কে তফসীরবিদ ও ইতিহাসবিদদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। অধিক প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, আদের দাদার নাম ইরাম। তাঁর এক পুত্র আওসের বংশধররাই আদ। তাদেরকে প্রথম আদ বলা হয়। অপর পুত্র জাসুর পুত্র হচ্ছে সামূদ। তার বংশধরকে দ্বিতীয় আদ বলা হয়। এ বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, আদ ও সামূদ উভয়ই ইরামের দু'শাখা। এক শাখাকে প্রথম আদ এবং অপর শাখাকে সামূদ অথবা দ্বিতীয় আদ বলা হয়। ইরাম শব্দটি আদ ও সামূদ উভয়ের জন্যে সমভাবে প্রযোজ্য।

আদ সম্প্রদায়ের তেরটি পরিবার ছিল। আম্মান থেকে শুরু করে হাযরামাওত ও ইয়ামন পর্যন্ত তাদের বসতি ছিল। তাদের খেত-খামারগুলো অত্যন্ত সজীব ও শস্যশ্যামল ছিল। সব রকম বাগান ছিল। তারা ছিল সুঠামদেহী ও বিরাট বপুসম্পন্ন। আয়াতে وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً বাক্যের উদ্দেশ্য তাই। আল্লাহ্ তাআলা তাদের সামনে দুনিয়ার যাবতীয় নেয়ামতের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু বক্রবুদ্ধির কারণেই এসব নেয়ামতই তাদের জন্যে কাল হয়ে দাঁড়াল। তারা শক্তিমদমত্ত হয়ে مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً (আমাদের চাইতে শক্তিশালী কে?) -এর ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে থাকে।

যে বিশ্ব প্রতিপালকের নেয়ামতের বৃষ্টি তাদের উপর বর্ষিত হচ্ছিল, তারা তাঁকে পরিত্যাগ করে মূর্তিপূজায় আত্মনিয়োগ করে।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ আদ সম্প্রদায়ের উপর যখন আযাব আসে, তখন তাদের একটি প্রতিনিধিদল মক্কা গমন করেছিল। ফলে তারা আযাব থেকে রক্ষা পেয়ে যায়—তাদেরকে দ্বিতীয় আদ বলা হয়। -(বয়ানুল কোরআন)

'হুদ' একজন পয়গম্বরের নাম। তিনি নূহ্ (আঃ)-এর পঞ্চম পুরুষের মধ্যে এবং সামের বংশধরের এক ব্যক্তি। আদ সম্প্রদায় এবং হুদ (আঃ)-এর বংশতালিকা চতুর্থ পুরুষে সাম পর্যন্ত পৌছে এক হয়ে যায়।— তাই হুদ (আঃ) আদের বংশগত ভাই। এ কারণেই আয়াতে أَخَاهُمْ هُودًا (তাদের ভাই হুদ) বলা হয়েছে।

হযরত হুদ (আঃ)-এর বংশতালিকা ও কিছু জীবন-চরিত্র ঃ আল্লাহ্ তাআলাই তাদের হেদায়েতের জন্যে হুদ (আঃ)-কে পয়গম্বররূপে প্রেরণ করেন। তিনি ছিলেন তাদেরই পরিবারের একজন। আরব বংশ বিশেষজ্ঞ আবুল বারাকাত জওফী লিখেন ঃ হুদ (আঃ)-এর পুত্র ইয়ারাব ইবনে কাহতান ইয়ামনে পৌছে বসতি স্থাপন করে। ইয়ামনের সব সম্প্রদায় তাঁরই বংশধর। আরবী ভাষার সূচনা তাঁর থেকেই হয়েছে এবং তাঁর নামানুসারে ভাষার নাম আরবী এবং এ ভাষাভাষীদের নাম হয়েছে আরব।—(বাহরে-মুহীত)

কিন্তু বিশুদ্ধ তথ্য এই যে, আরবী ভাষা নূহ্ (আঃ)-এর আমল থেকেই প্রচলিত ছিল। নূহ্ (আঃ)-এর নৌকার একজন আরোহী জুরহাম আরবী ভাষায় কথা বলতেন। _ (বাহ্রে-মুহীত)। জুরহাম থেকেই মক্কা শহর আবাদ হয়েছে। এটা সম্ভব যে, ইয়ামনে আরবী ভাষার সূচনা ইয়ারাব ইবনে কাহ্তান থেকে হয়েছিল। আবুল বারাকাতের বক্তব্যের উদ্দেশ্যও তাই।

হযরত হুদ (আঃ) আদ জাতিকে মূর্তিপূজা ত্যাগ করে একত্ববাদের অনুসরণ করতে এবং অত্যাচার-উৎপীড়ন ত্যাগ করে ন্যায় ও সুবিচারের পথ ধরতে আদেশ করেন। কিন্তু তারা স্বীয় ধনৈশ্বর্যের মোহে মত্ত হয়ে তাঁর আদেশ অমান্য করে। এর পরিণতিতে তাদের উপর প্রথম আযাব নাযিল হয় এবং তিন বছর পর্যন্ত উপর্যুপরি বৃষ্টি বন্ধ থাকে। তাদের শস্যক্ষেত্র শুষ্ক বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যায়। বাগান জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা শেরেক ও মূর্তি পূজা ত্যাগ করে না। অতঃপর আট দিন সাত রাত্রি পর্যন্ত তাদের উপর প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের আযাব সওয়ার হয়। ফলে তাদের অবশিষ্ট বাগবাগিচা ও দালান-কোঠা ভূমিসাৎ হয়ে যায়। মানুষ ও জীবজন্তু শূন্যে উড়তে থাকে। অতঃপর উপুড় হয়ে মাটিতে পড়তে থাকে। এভাবে আদ জাতিকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে ঃ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا অর্থাৎ, আমি মিথ্যারোপকারীদের বংশ কেটে দিয়েছি। এর মর্ম কোন কোন তফসীরকার এটাই স্থির করেছেন যে, তখন তাদের মধ্যে যারা জীবিত ছিল তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। কেউ কেউ এর অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, ভবিষ্যতের জন্যেও আদ জাতিকে নির্বংশ করে দেয়া হয়েছে।

হযরত হুদ (আঃ)-এর আদেশ অমান্য করা এবং কুফর ও শেরেকে লিপ্ত থাকার কারণে যখন আদ জাতির উপর আযাব নাযিল হয়, তখন হুদ (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীরা একটি কুঁড়ে ঘরে আশ্রয়গ্রহণ করেন। আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে বিরাট বিরাট অট্টালিকা মাটিতে লুটিয়ে পড়লেও এ কুঁড়ে ঘরটিতে বাতাস খুব সুষম পরিমাণে প্রবেশ করত। হযরত হুদ (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীরা ঠিক আযাবের মুহূর্তেও এখানে নিশ্চিন্তে বসে রইলেন। তাঁদের কোন কষ্টই হয়নি। সবাই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তিনি মক্কায় চলে যান এবং সেখানেই ওফাত পান।—(বাহ্রে মুহীত)

আদ জাতির উপর ঘূর্ণিঝড়ের আকারে আযাব আসা কোরআন পাকে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত রয়েছে। সূরা মুমিনূনে নূহ (আঃ)-এর কাহিনী উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ অর্থাৎ, অতঃপর আমি তাদের পরে আরও একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি। বাহ্যতঃ এরাই হচ্ছে 'আদ' জাতি। পরে এ সম্প্রদায়ের কাজ-কর্ম ও কথা বার্তা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে - فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ অর্থাৎ, একটি বিকট শব্দ তাদেরকে পাকড়াও করল। এ আয়াতের ভিত্তিতে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ আদ জাতির উপর বিকট ধরনের শব্দের আযাব সওয়ার হয়েছিল। কিন্তু উভয় মতের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। এটা সম্ভব যে, বিকট শব্দ ও ঘূর্ণিঝড় উভয়টিই হয়েছিল।

এ হচ্ছে আদ জাতি ও হযরত হুদ (আঃ)-এর সংক্ষিপ্ত ঘটনা। কোরআন পাকের ভাষায় এর বিবরণ এরূপ ঃ

৬৫ নং আয়াত وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ অর্থাৎ, আমি আদ জাতির প্রতি তাদের

ভাই হূদ (আঃ) – কে হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করেছি। সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা শুধু আল্লাহ্ তাআলারই এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমরা কি ভয় কর না?

আদ জাতির পূর্বে নূহ্ (আঃ)–এর সম্প্রদায়ের উপর পতিত মহাশাস্তির স্মৃতি তখনও মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি। তাই হূদ (আঃ) আযাবের কঠোরতা বর্ণনা করা প্রয়োজন মনে করেননি। বরং এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করেছেন যে, তোমরা কি ভয় কর না?

৬৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖٓ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ অর্থাৎ, সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলেন ঃ আমরা তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত দেখতে পাচ্ছি। আমাদের ধারণা, তুমি একজন মিথ্যাবাদী।

এটা প্রায় নূহ্ (আঃ)–এর সম্প্রদায়ের প্রত্যুত্তরের মতই—শুধু কয়েকটি শব্দের পার্থক্য মাত্র। তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে এর উত্তর প্রায় তেমনি দেয়া হয়েছে, যেমন নূহ্ (আঃ) দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, আমার মধ্যে কোন নির্বুদ্ধিতা নেই। ব্যাপার শুধু এতটুকু যে, আমি বিশ্ব পালনকর্তার কাছ থেকে রাসূল হয়ে এসেছি। তাঁর বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছাই। আমি সুস্পষ্টভাবে তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। তাই তোমাদের পৈতৃক মূর্খতায় তোমাদের সঙ্গী হওয়ার পরিবর্তে তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য কথা তোমাদের কাছে পৌঁছে দেই। কিন্তু তা তোমাদের মনঃপূত নয়।

পঞ্চম আয়াতে আদ জাতির সে আপত্তির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে, যা তাদের পূর্বে নূহ (আঃ)–এর সম্প্রদায় উত্থাপন করেছিল। অর্থাৎ, আমরা নিজেদেরই মত কোন মানুষকে নেতারূপে কিভাবে মেনে নিতে পারি? কোন ফেরেশতা হলে মেনে নেয়া সম্ভবপর ছিল। এর উত্তরেও কোরআন পাক তাই উল্লেখ করেছে, যা নূহ্ (আঃ) দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, কোন মানুষ আল্লাহ্র রসূল হয়ে মানুষকে ভয় প্রদর্শনের জন্যে আসবেন। কেননা, মানুষকে বোঝানোর জন্যে মানুষের পয়গম্বর হওয়াই কার্যকরী হতে পারে।

এরপর আদ জাতিকে আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে বলা হয়েছে ঃ

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِي
الْخَلْقِ بَصْۜطَةً ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

অর্থাৎ, স্মরণ কর যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে কওমে নূহের পর ভূপৃষ্ঠের মালিক করে দিয়েছেন এবং দেহাবয়বে বিশালতা সম্পদ জনসংখ্যায় আধিক্য দিয়েছেন। আল্লাহ্র এসব নেয়ামত স্মরণ করলে তোমাদের মঙ্গল হবে।

কিন্তু এ অবাধ্য জাতি এসব উপদেশের প্রতি কর্ণপাত করল না। তারা পথভ্রষ্টদের চিরাচরিত প্রথায় উত্তর দিল ঃ তুমি কি আমাদের বাপ–দাদাদের ধর্ম আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চাও? দেবতাদেরকে ছেড়ে আমরা এক আল্লাহ্র এবাদত করি—এটাই কি তোমার কাম্য? না, আমরা তা করতে পারব না। তুমি যে শাস্তির হুমকি দিচ্ছ, তা নিয়ে আস যদি সত্যবাদী হও।

৬৭নং আয়াতে হূদ (আঃ) উত্তর দিয়েছেন ঃ তোমরা যখন এমনি অবাধ্য ও অজ্ঞান, তখন তোমাদের উপর আল্লাহ্র গযব ও শাস্তি এল বলে, তোমরা অপেক্ষা কর। আমিও এখন তারই প্রতীক্ষা করছি। জাতির এ উস্কানিমূলক উত্তর শুনে তিনি আযাব আসার সংবাদ দিয়েছিলেন বটে; কিন্তু পয়গম্বরসুলভ দয়া ও শুভেচ্ছা তাঁকে সাথে সাথে একথা বলতেও বাধ্য করল ঃ পরিতাপের বিষয়, তোমরা এবং তোমাদের বাপ–দাদারা জড় ও অচেতন পদার্থসমূহকে উপাস্য করে নিয়েছে। এদের উপাস্য হওয়ার না কোন যুক্তিগত প্রমাণ আছে, না ইতিহাসগত। এদের এবাদতে তোমরা এতই পাকা হয়ে গেছ যে, এদের সমর্থনে আমার সাথে বিতর্ক করে যাচ্ছ।

সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে, হূদ (আঃ)–এর সব প্রচেষ্টা এবং আদ জাতির অবাধ্যতার সর্বশেষ পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, আমি হূদ ও তাঁর সাথী মুমিনদেরকে আযাব থেকে নিরাপদে রেখেছি এবং মিথ্যারোপকারীদের মূল কেটে দিয়েছি। তারা বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিল না।

এ কাহিনীতে গাফেলদের জন্যে আল্লাহ্র স্মরণ ও আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করার নির্দেশ, বিরুদ্ধাচরণকারীদের জন্যে শিক্ষাসামগ্রী এবং প্রচারক সংস্কারকদের জন্যে পয়গম্বরসুলভ প্রচার ও সংস্কারপদ্ধতির শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে।

أُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِيْنٌ ﴿٦٨﴾ أَوَعَجِبْتُمْ
أَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ۚ
وَاذْكُرُوْٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ
فِي الْخَلْقِ بَصْۜطَةً ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٦٩﴾
قَالُوْٓا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ
اٰبَآؤُنَا ۚ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٧٠﴾
قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ ۚ
أَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْٓ أَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوْهَآ أَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّا
نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ فَانْتَظِرُوْٓا إِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ
الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿٧١﴾ فَأَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَ
قَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٢﴾
وَإِلٰى ثَمُوْدَ أَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا
لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۚ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۚ
هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَأْكُلْ فِيْٓ
أَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾

(৬৮) তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছাই এবং আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী বিশ্বস্ত। (৬৯) তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্য থেকেই একজনের বাচনিক উপদেশ এসেছে—যাতে সে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে। তোমরা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ তোমাদেরকে কওমে নূহের পর সর্দার করেছেন এবং তোমাদের দেহের বিস্তৃতি বেশী করেছেন। তোমরা আল্লাহ্র নেয়ামতসমূহ স্মরণ কর–যাতে তোমাদের মঙ্গল হয়। (৭০) তারা বললঃ তুমি কি আমাদের কাছে এজন্যে এসেছ যে আমরা এক আল্লাহ্র এবাদত করি এবং আমাদের বাপ–দাদা যাদের পূজা করত, তাদেরকে ছেড়ে দেই? অতএব নিয়ে আস আমাদের কাছে যদ্দ্বারা আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছ, যদি তুমি সত্যবাদী হও। (৭১) সে বলল ঃ অবধারিত হয়ে গেছে তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে শাস্তি ও ক্রোধ। আমার সাথে ঐসব নাম সম্পর্কে কেন তর্ক করছ, যেগুলো তোমরা ও তোমাদের বাপ–দাদারা রেখেছে। আল্লাহ্ এদের কোন মন্দ অবতীর্ণ করেননি। অতএব অপেক্ষা কর। আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি। (৭২) অনন্তর আমি তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে রক্ষা করলাম এবং যারা আমার আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করত তাদের মূল কেটে দিলাম। তারা মান্যকারী ছিল না। (৭৩) সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই সালেহ্কে। সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্র এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ এসে গেছে। এটি আল্লাহ্র উষ্ট্রী—তোমাদের জন্যে প্রমাণ। অতএব একে ছেড়ে দাও, আল্লাহ্র ভূমিতে চড়ে বেড়াবে। একে অসৎভাবে স্পর্শ করবে না। অন্যথায় তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ছালেহ্ (আঃ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। যেমন, ইতিপূর্বে কওমে নূহ ও কওমে হূদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। সূরা আ'রাফের শেষ পর্যন্ত পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতদের অবস্থা এবং সত্যের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার কারণে তাদের কুফর ও অশুভ পরিণতির বিষয় বর্ণিত হবে।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে وَإِلٰى ثَمُوْدَ أَخَاهُمْ صٰلِحًا ইতিপূর্বে আদ জাতির আলোচনায় বলা হয়েছে যে, আদ ও সামূদ একই দাদার বংশধরের দু'ব্যক্তির নাম। তাদের সন্তানরাও তাদের নামে অভিহিত হয়ে দু'সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। একটি আদ সম্প্রদায়, আর একটি সামূদ সম্প্রদায়। তারা আরবের উত্তর পশ্চিম এলাকায় বসবাস করত। তাদের প্রধান শহরের নাম ছিল 'হজর'। বর্তমানে একে সাধারণতঃ 'মাদায়েনে ছালেহ' বলা হয়। আদ জাতির মত সামূদ জাতিও সম্পন্ন, শক্তিশালী ও বীর জাতি ছিল। তারা প্রস্তর খোদাই ও স্থাপত্য বিদ্যায় খুবই পারদর্শী ছিল। সমতল ভূমিতে বিশালকায় অট্টালিকা নির্মাণ ছাড়াও পর্বত খোদাই করে নানা রকম প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করত। আরদুল কোরআন গ্রন্থে মাওলানা সাইয়োদ সোলায়মান নদভী লিখেছেন ঃ তাদের স্থাপত্যের নিদর্শনাবলী আজও পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। এগুলোর গায়ে ইরামী ও সামূদী বর্ণমালায় শিলালিপি রয়েছে।

পার্থিব বিত্ত ও ধনৈশ্বর্যের পরিণতি প্রায়ই অশুভ হয়ে থাকে। বিত্তশালীরা আল্লাহ্ ও পরকাল ভুলে গিয়ে ভ্রান্তপথে পা বাড়ায়। সামূদ জাতির বেলায়ও তাই হয়েছে।

অথচ পূর্ববর্তী কওমে নূহের শাস্তির ঘটনাবলী তখনও লোকমুখে আলোচিত হত এবং আদ জাতির ধ্বংসের কাহিনী যেন সাম্প্রতিক কালের ঘটনা বলে বিবেচিত হত। কিন্তু ঐশ্বর্য ও শক্তির নেশা এমনি জিনিস যে, একজনের ধ্বংসস্তূপের উপর অন্যজন এসে স্বীয় প্রাসাদ নির্মাণ করে এবং প্রথম জনের ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণ ভুলে যায়। আদ জাতির ধ্বংসের পর সামূদ জাতি তাদের পরিত্যক্ত ঘরবাড়ী ও সহায়–সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় এবং যে সব জায়গায় নিজেদের বিলাস বহুল প্রাসাদ গড়ে তোলে, সেখানেই তাদের ভাইয়েরা নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। তারা আদ জাতির অনুরূপ কার্যকলাপও শুরু করে দেয়। আল্লাহ্ ও পরকাল বিস্মিত হয়ে শিরক ও মূর্তি পূজায় মনোনিবেশ করে। আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় চিরন্তন রীতি অনুযায়ী তাদের হেদায়েতের জন্যে ছালেহ্ (আঃ) কে পয়গম্বররূপে প্রেরণ করেন। তিনি বংশ ও দেশের দিক দিয়ে সামূদ জাতিরই একজন এবং সামেরই বংশধর ছিলেন। একারণেই আয়াতে তাঁকে أَخَاهُمْ صٰلِحًا অর্থাৎ, সামূদ জাতির ভাই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ছালেহ্ (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে সে দাওয়াতই দেন, যা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে তখনও পর্যন্ত সমস্ত পয়গম্বর দিয়ে এসেছিলেন। যেমন, কোরআনে বলা হয়েছে ঃ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلًا أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ অর্থাৎ, আমি প্রত্যেক উম্মতে একজন করে রসূল প্রেরণ করেছি, যাতে তারা মানুষকে আল্লাহ্র এবাদত করার ও মূর্তি পূজা পরিহার করার নির্দেশ দেয়। পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের ন্যায় ছালেহ্ (আঃ)ও তাঁর জাতিকে একথাই বললেন যে, আল্লাহ্ তাআলাকে প্রতিপালক ও স্রষ্টা মনে কর। তিনি ব্যতীত এবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তাঁর ভাষায় يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهٗ

এতদসঙ্গে আরও বললেন ঃ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ অর্থাৎ, এখন তো একটি সুস্পষ্ট নিদর্শনও প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসে গেছে। এ নিদর্শনের অর্থ একটি আশ্চর্য ধরনের উষ্ট্রী। এ আয়াতে এর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ রয়েছে। এবং কোরআনের বিভিন্ন সূরায় এর বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে। এ উষ্ট্রির ঘটনা এই যে, হযরত ছালেহ (আঃ) যৌবনকাল থেকেই স্বীয় সম্প্রদায়কে একত্ববাদের দাওয়াত দিতে শুরু করেন এবং এ কাজেই বার্ধক্যের দ্বারে উপনীত হন। তাঁর বার বার পীড়াপীড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা স্থির করল যে, তাঁর কাছে এমন একটি দাবী করতে হবে যা পূরণ করতে তিনি অক্ষম হয়ে পড়বেন এবং আমরা তাঁর বিরুদ্ধে জয়লাভ করব। সে মতে তারা দাবী করল যে, আপনি যদি বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র পয়গম্বর হন, তবে আমাদেরকে 'কাতেবা পাহাড়ের ভিতর থেকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী, সবল ও স্বাস্থ্যবতী উষ্ট্রী বের করে দেখান।

ছালেহ (আঃ) প্রথমে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, যদি আমি তোমাদের দাবী পূরণ করে দেই, তবে তোমরা আমার প্রতি ও আমার দাওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে কি না? সবাই যখন এই মর্মে অঙ্গীকার করল, তখন ছালেহ্ (আঃ) দু'রাকআত নামায পড়ে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলেন, 'ইয়া পরওয়ারদেগার, আপনার জন্যে কোন কাজই কঠিন নয়। তাদের দাবী পূরণ করে দিন।' দোয়ার সাথে সাথে পাহাড়ের গায়ে স্পন্দন দেখা গেল এবং একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড বিস্ফোরিত হয়ে তার ভেতর থেকে দাবীর অনুরূপ একটি উষ্ট্রী বের হয়ে এল।

ছালেহ্ (আঃ)-এর এ বিস্ময়কর মো'জেযা দেখে কিছু লোক তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে গেল এবং অবশিষ্টরাও মুসলমান হওয়ার ইচ্ছা করল, কিন্তু দেবদেবীদের বিশেষ পূজারী ও মূর্তিপূজার ঠাকুর ধরনের কিছু সর্দার তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দিল। হযরত ছালেহ্ (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে দেখে শঙ্কিত হলেন যে, এদের উপর আযাব এসে যেতে পারে। তাই পয়গম্বরসুলভ দয়া প্রকাশ করে বললেন ঃ এ উষ্ট্রীর দেখাশোনা কর। একে কোনরূপ কষ্ট দিও না। এভাবে হয়ত তোমরা আযাব থেকে বেঁচে যেতে পার। এর অন্যথা হলে তোমরা সাথে সাথে আযাবে পতিত হবে। নিম্নোক্ত আয়াতে এই কথাই ব্যক্ত হয়েছে ঃ

هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ অর্থাৎ, এটি আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী —তোমাদের জন্যে নিদর্শন। অতএব একে আল্লাহ্‌র যমিনে চরে বেড়াতে দাও এবং একে অনিষ্টের অভিপ্রায়ে স্পর্শ করো না। নতুবা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে। এ উষ্ট্রীকে 'আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী' বলার কারণ এই যে, এটি আল্লাহ্‌র আসীম শক্তির নির্দশন এবং ছালেহ (আঃ)-এর মো'জেযা হিসেবে বিস্ময়কর পন্থায় সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন, হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মও অলৌকিক পন্থায় হয়েছিল বলে তাঁকে রূহুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র আত্মা) বলা হয়েছে। تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ উষ্ট্রীর পানাহারে তোমাদের মালিকানা ও তোমাদের ঘর থেকে কিছুই ব্যয় হয় না। যমিন আল্লাহ্‌র এবং এর উৎপন্ন ফসলও আল্লাহ্‌র সৃজিত। কাজেই তাঁর উষ্ট্রীকে তাঁর যমিনে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দাও, যাতে সাধারণভাবে চারণ ক্ষেত্রে বিচরণ করে বেড়াতে পারে।

সামুদ জাতি যে কূপ থেকে পানি পান করত এবং জন্তুদেরকে পান করাত, এ উষ্ট্রীও সে কূপ থেকেই পানি পান করত। কিন্তু এ আশ্চর্য ধরনের উষ্ট্রী যখন পানি পান করত, তখন পানি নিঃশেষে পান করে ফেলত। হযরত ছালেহ্ (আঃ) আল্লাহ্‌র নির্দেশে ফয়সালা করে দিলেন যে, একদিন এ উষ্ট্রী পানি পান করবে এবং অন্য দিন সম্প্রদায়ের সবাই পানি নিবে। যেদিন উষ্ট্রী পানি পান করত সেদিন অন্যরা উষ্ট্রীর দুধ দ্বারা তাদের সব পাত্র ভর্তি করে নিত। কোরআনের অন্যত্র এভাবে পানি বন্টনের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ

وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ — অর্থাৎ, হে ছালেহ তুমি স্বজাতিকে বলে দাও যে, কূপের পানি তাদের এবং উষ্ট্রীর মধ্যে বন্টন হবে—একদিন উষ্ট্রীর এবং পরবর্তী দিন তাদের। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফেরেশতারা এ বন্টন ব্যবস্থা দেখাশোনা করবে—যাতে কেউ এর খেলাফ করতে না পারে। অন্য এক আয়াতে আছে هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ অর্থাৎ, এটি আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী। একদিন এর পানি এবং অন্য নির্দিষ্ট দিনের পানি তোমাদের।

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ
فِى الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ
الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ
مُفْسِدِيْنَ ﴿٧٤﴾ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ
لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا
مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۗ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿٧٥﴾
قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا بِالَّذِىْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ
كٰفِرُوْنَ ﴿٧٦﴾ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَ
قَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ
الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٧٧﴾ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ
جٰثِمِيْنَ ﴿٧٨﴾ فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ
رِسَالَةَ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٧٩﴾
وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ
بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ
شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ۗ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿٨١﴾

(৭৪) তোমরা স্মরণ কর, যখন তোমাদেরকে আদ জাতির পরে সর্দার করেছেন; তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠিকানা দিয়েছেন। তোমরা নরম মাটিতে অট্টালিকা নির্মাণ কর এবং পর্বত গাত্র খনন করে প্রকোষ্ঠ নির্মাণ কর। অতএব আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। (৭৫) তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক সর্দাররা ঈমানদার দরিদ্রদেরকে জিজ্ঞেস করল ঃ তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, সালেহ্‌কে তার পালনকর্তা প্রেরণ করেছেন? তারা বলল ঃ আমরা তো তার আনীত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসী। (৭৬) দাম্ভিকরা বলল ঃ তোমরা যে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা তাতে অস্বীকৃত। (৭৭) অতঃপর তারা উষ্ট্রীকে হত্যা করল এবং স্বীয় প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল। তারা বলল ঃ হে ছালেহ্‌, নিয়ে এস যদ্দ্বারা আমাদেরকে ভয় দেখাতে, যদি তুমি রাসূল হয়ে থাক। (৭৮) অতঃপর পাকড়াও করল তাদেরকে ভূমিকম্প। ফলে সকাল বেলায় নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (৭৯) ছালেহ্‌ তাদের কাছ থেকে প্রস্থান করলো এবং বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদের কাছে স্বীয় প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছিয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি কিন্তু তোমরা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদেরকে ভালবাস না। (৮০) এবং আমি লূতকে প্রেরণ করেছি। যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল ঃ তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বের কেউ করেনি? (৮১) তোমরা তো কামবশতঃ পুরুষদের কাছে গমণ কর নারীদেরকে ছেড়ে। বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

৭৪ নং আয়াতে এ অবাধ্য ও অঙ্গীকারভঙ্গকারী জাতির শুভেচ্ছা ও তাদেরকে আযাব থেকে বাঁচানোর জন্যে পুনরায় তাদেরকে আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহ স্মরণ করানো হয়েছে, যাতে তারা অবাধ্যতা পরিহার করে। বলা হয়েছে ঃ

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ ...

..... এতে خُلَفَاءَ শব্দটি خليفة এর বহুবচন। এর অর্থ স্থলাভিষিক্ত ও প্রতিনিধি। قصور শব্দটি قصر এর বহুবচন। এর অর্থ উচ্চ অট্টালিকা ও প্রাসাদ। تنحتون শব্দটি نحت –থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ প্রস্তর খোদাই করা। جبال শব্দটি جبل এর বহুবচন। এর অর্থ পাহাড়। بيوتا শব্দটি بيت - এর বহুবচন। এর অর্থ প্রকোষ্ঠ। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তা'আলার নেয়ামত স্মরণ কর যে, তিনি আদ জাতিকে ধ্বংস করে তাদের স্থলে তোমাদেরকে অভিষিক্ত করেছেন, তাদের ঘরবাড়ী ও সহায়-সম্পত্তি তোমাদেরকে দান করেছেন এবং তোমাদেরকে এ শিল্প কার্য শিক্ষা দিয়েছেন যে, উন্মুক্ত জয়গায় তোমরা প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করে ফেল এবং পাহাড়ের গাত্র খোদাই করে তাতে প্রকোষ্ঠ তৈরী কর। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহ স্মরণ কর, অনুগ্রহ স্বীকার কর, তাঁর আনুগত্য অবলম্বন কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে ফিরো না।

জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় মৌলিক ও শাখাগত মাসআলা জানা যায়।

(এক) ধর্মের মূল বিশ্বাসসমূহে সব পয়গাম্বরই একমত এবং তাঁদের সবার শরীয়তই অভিন্ন। সবারই দাওয়াত ছিল এক আল্লাহ্‌র এবাদত করা এবং এর বিরুদ্ধাচরণের কারণে ইহকাল ও পরকালের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা।

(দুই) পূর্ববর্তী সব উম্মতের মধ্যে এই হয়েছে যে, সম্প্রদায়ের বিত্তশালী ও প্রধানরা পয়গম্বরদের দাওয়াত কবুল করেনি। ফলে তারা ইহকালেও ধ্বংস হয়েছে এবং পরকালেও শাস্তির যোগ্য হয়েছে।

(তিন) তফসীর কুরতুবীতে বলা হয়েছে, এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ্‌র নেয়ামত সমূহ দুনিয়াতে কাফেরদেরকেও দান করাহয়; যেমন, আদ ও সামূদ জাতির সামনে আল্লাহ্‌ তাআলা ধন-সম্পদ ও শক্তির দ্বার খুলে দিয়েছেন।

(চার) তফসীর কুরতুবীতে আছে, এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, সুউচ্চ প্রাসাদ ও বৃহদাকার অট্টালিকা নির্মাণ করাও আল্লাহ্‌ তাআলার নেয়ামত ও বৈধ।

এটা ভিন্ন কথা যে, কোন নবী, রাসূল ও ওলীগণ অট্টালিকা পছন্দ করেননি। কারণ, এগুলো মানুষকে গাফেল করে দেয়। রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) থেকে সুউচ্চ প্রসাদ নির্মাণ সম্পর্কে যেসব বক্তব্য বর্ণিত আছে, সেগুলো এধরনেরই।

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে সামূদ জাতির দু'দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংলাপ উল্লেখ করা হয়েছে। একদল ছালেহ্‌ (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। দ্বিতীয় দল ছিল অবিশ্বাসী কাফেরদের। বলা হয়েছে ঃ

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ

آمَنَ مِنْهُمْ অর্থাৎ, ছালেহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা অহঙ্কারী ছিল, তারা তাদেরকে বলল, যাদেরকে দুর্বল ও হীন মনে করা হত—অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল।

ইমাম রাযী তফসীর কবীরে বলেন ঃ এখানে দু'দলের দুটি গুণ ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু কাফেরদের গুণটি صيغة معروف এ اسْتَكْبَرُوا বলা হয়েছে এবং মুমিনদের গুণটি صيغة مجهول এ اسْتُضْعِفُوا বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কাফেরদের অহঙ্কার গুণটি ছিল তাদের নিজস্ব কাজ যা, দণ্ডনীয়, তিরস্কৃত ও পরিণামে শাস্তির কারণ হয়েছে। পক্ষান্তরে মুমিনদের যে বিশেষণ তারা বর্ণনা করত যে, এরা নিকৃষ্ট, হীন ও দুর্বল, এটা কাফেরদেরই কথা, স্বয়ং মুমিনদের বাস্তব অবস্থা ও বিশেষণ নয়, যা তিরস্কারযোগ্য হতে পারে। বরং তিরস্কার তাদেরই প্রাপ্য, যারা বিনা কারণে তাদেরকে হীন ও দুর্বল বলত ও মনে করত। উভয় দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংলাপ ছিল এই যে, কাফেররা মুমিনদেরকে বলল ঃ তোমরা কি বাস্তবিকই জান যে, ছালেহ্ (আঃ) তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরীত রসূল?

উত্তরে মুমিনরা বলল ঃ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে হেদায়েতসহ তিনি প্রেরিত হয়েছেন আমরা সেগুলোর প্রতি বিশ্বাসী।

তফসীর কাশ্শাফে বলা হয়েছে ঃ সামূদ জাতির মুমিনরা কি চমৎকার অংকারপূর্ণ উত্তরই না দিয়েছে যে, তোমরা এ আলোচনায় ব্যস্ত রয়েছ যে, তিনি রসূল কি না। আসলে এটা আলোচনার বিষয়ই নয় ; বরং জাজ্বল্যমান ও নিশ্চিত। সাথে সাথে এটাও নিশ্চিত যে, তিনি যা বলেন, তা আল্লাহ্ তাআলার কাছে থেকে আনীত পয়গাম। জিজ্ঞাস্য বিষয় কিছু থাকলে তা এই যে, কে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কে করে না? আল্লাহ্র ফযলে আমরা তাঁর আনীত সব নির্দেশের প্রতিই বিশ্বাসী।

কিন্তু তাদের অলংকারপূর্ণ উত্তর শুনেও সামূদ জাতি পূর্ববৎ ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে বললঃ যে বিষয়ের প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা তা মানি না। দুনিয়ার মহব্বত, ধন-সম্পদ ও শক্তির মত্ততা থেকে আল্লাহ্ তাআলা নিরাপদ রাখুন। এগুলো মানুষের চোখে পর্দা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তারা জাজ্বল্যমান বিষয়কেও অস্বীকার করতে শুরু করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, ছালেহ্ (আঃ)-এর দোয়ায় পাহাড়ের একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড বিস্ফোরিত হয়ে আশ্চর্য ধরনের এক উষ্ট্রী বের হয়ে এসেছিল। আল্লাহ্ তাআলা এ উষ্ট্রীকেই এ সম্প্রদায়ের জন্যে সর্বশেষ পরীক্ষার বিষয় করে দিয়েছিলেন। সেমতে সে জনপদের সব মানুষ ও জীব-জন্তু যে কূপ থেকে পানি পান করত, উষ্ট্রী তার সব পানি পান করে ফেলত। তাই ছালেহ্ (আঃ) তাদের জন্যে পানির পালা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন যে, একদিন উষ্ট্রী পানি পান করবে এবং অন্য দিন জনপদের অধিবাসীরা।

সুতরাং এ উষ্ট্রীর কারণে সামূদ জাতির বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। ফলে তারা এর ধ্বংস কামনা করত। কিন্তু আযাবের ভয়ে নিজেরা একে ধ্বংস করতে উদ্যোগী হত না।

যে সুবৃহৎ প্রতারণার মাধ্যমে শয়তান মানুষের বুদ্ধি-জ্ঞান ও চেতনাকে বিলুপ্ত করে দেয়, তা হচ্ছে নারীর প্রলোভন। সুতরাং সম্প্রদায়ের দু'জন পরমাসুন্দরী নারী বাজী রাখল যে, যে ব্যক্তি এ উষ্ট্রীকে হত্যা করবে, সে আমাদের এবং আমাদের কন্যাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারবে।

সম্প্রদায়ের দু'জন যুবক মিছদা' ও কাসার এ নেশায় মত্ত হয়ে উষ্ট্রীকে হত্যা করার জন্যে বেরিয়ে পড়ল। তারা উষ্ট্রীর পথে একটি বড় প্রস্তর খণ্ডের আড়ালে আত্মগোপণ করে বসে রইল। উষ্ট্রী সামনে আসতেই মিছদা' তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করল এবং কাসার তরবারির আঘাতে তার পা কেটে হত্যা করল।

কোরআন পাক তাকেই সামূদ জাতির সর্ববৃহৎ হতভাগ্য বলে আখ্যা দিয়ে বলেছে ঃ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا কেননা, তার কারণেই গোটা সম্প্রদায় আযাবে পতিত হয়।

উষ্ট্রী হত্যার ঘটনা জানার পর ছালেহ্ (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে আল্লাহর নির্দেশ জানিয়ে দিলেন যে, এখন থেকে তোমাদের জীবন কাল মাত্র তিন দিন অবশিষ্ট রয়েছে। تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ অর্থাৎ, আরও তিন দিন আরাম করে নাও (এরপরই আযাব নেমে আসবে)। এ ওয়াদা সত্য, এর ব্যতিক্রম হওয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু যে জাতির দুঃসময় ঘনিয়ে আসে, তার জন্যে কোন উপদেশ ও হুশিয়ারী কার্যকর হয় না। সুতরাং ছালেহ (আঃ)-এর একথা শুনেও তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে বলল ঃ এ শাস্তি কিভাবে এবং কোথা থেকে আসবে? এর লক্ষণ কি হবে?

ছালেহ (আঃ) বললেন ঃ তাহলে আযাবের লক্ষণও শুনে নাও—আগামী কাল বৃহস্পতিবার তোমাদের নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবার মুখমণ্ডল হলদে ফ্যাকাশে হয়ে যাবে। অতঃপর পরশু শুক্রবার সবার মুখমণ্ডল গাঢ় লাল বর্ণ ধারণ করবে। অতঃপর শনিবার দিন সবার মুখমণ্ডল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যাবে। এটাই হবে তোমাদের জীবনের শেষ দিন। হতভাগ্য জাতি একথা শুনেও ক্ষমা প্রার্থনা করার পরিবর্তে স্বয়ং ছালেহ্ (আঃ)-কেই হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। তারা ভাবল, যদি সে সত্যবাদী হয় এবং আমাদের উপর আযাব আসেই, তবে আমরা নিজেদের পূর্বে তার ভবলীলাই সাঙ্গ করে দেই না কেন? পক্ষান্তরে যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে মিথ্যার সাজা ভোগ করুক। সামূদ জাতির এ সংকল্পের বিষয় কোরআন পাকের অন্যত্র বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছু লোক রাতের বেলা ছালেহ (আঃ)-কে হত্যা করার উদ্দেশে তাঁর গৃহপানে রওয়ানা হল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা পথিমধ্যেই প্রস্তর বর্ষণে তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন।

وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ অর্থাৎ, তারাও গোপন ষড়যন্ত্র করল এবং আমিও প্রত্যুত্তরে এমন কৌশল অবলম্বন করলাম যে, তারা তা জানতেই পারল না। বৃহস্পতিবার ভোরে ছালেহ্ (আঃ)-এর কথা অনুযায়ী সবার মুখমণ্ডল গভীর হলুদ রঙে আচ্ছাদিত হয়ে গেল। প্রথম লক্ষণ সত্য হওয়ার পরও জালেমরা ঈমানের প্রতি মনোনিবেশ করল না; বরং তারা ছালেহ্ (আঃ)-এর প্রতি আরও চটে গেল এবং সমগ্র জাতি তাকে হত্যা করার জন্যে ঘোরাফেরা করতে লাগল। আল্লাহ রক্ষা করুন, তাঁর গযবেরও লক্ষণাদি থাকে। মানুষের মন ও মস্তিষ্ক যখন অধোমুখী হয়ে যায়, তখন লাভকে ক্ষতি ও ক্ষতিকে লাভ এবং ভালকে মন্দ ও মন্দকে ভাল মনে করতে থাকে।

দ্বিতীয়দিন ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সবার মুখমণ্ডল লাল এবং তৃতীয় দিন ঘোর কাল হয়ে গেল। তখন সবাই নিরাশ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল যে,

কোন্ দিক থেকে কিভাবে আযাব আসে।

এমতাবস্থায় ভীষণ ভূমিকম্প শুরু হল এবং উপর থেকে বিকট ও ভয়াবহ চিৎকার শুনা গেল। ফলে সবাই একযোগে বসা অবস্থায় অধোমুখী হয়ে ভূশায়ী হল। আলোচ্য আয়াতসমূহে ভূমিকম্পের কথা উল্লেখিত রয়েছে। فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ এখানে رجفة শব্দের অর্থ ভূমিকম্প।

অন্যান্য আয়াতে فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ ও বলা হয়েছে। صَيْحَةٌ শব্দের অর্থ ভীষণ চিৎকার ও বিকট শব্দ। উভয় আয়াতদৃষ্টে প্রতিয়মান হয় যে, তাদের উপর উভয় প্রকার আযাবই এসেছিল ; নীচের দিক থেকে ভূমিকম্প আর উপর দিক থেকে বিকট চিৎকার। ফলে তাদের فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ এ পরিণতি হয়েছিল। جاثم শব্দটি جثوم ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ চেতনাহীন হয়ে পড়ে যাওয়া কিংবা বসে থাকা। (কামূস) অর্থাৎ, যে যে অবস্থায় ছিল, সে সেভাবেই মৃত্যুমুখে পতিত হল। نعوذبالله من قهره وعذابه

এ কাহিনীর প্রধান অংশগুলো স্বয়ং কোরআন পাকের বিভিন্ন সূরায় এবং কিছু অংশ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। কিছু অংশ এমনও রয়েছে যা তফসীরবিদগণ ইসরাইলী (অর্থাৎ, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের) বর্ণনা থেকে সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু এগুলোর উপর কোন ঘটনার প্রমাণ নির্ভরশীল নয়।

ছহীহ্ বুখারীর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, তাবূক যুদ্ধের সফরে রসূলুল্লাহ (সাঃ) হিজর নামক সে স্থানটি অতিক্রম করেন, যেখানে সামূদ জাতির উপর আযাব এসেছিল। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দেন, কেউ যেন এ আযাব-বিধ্বস্ত এলাকার ভিতরে প্রবেশ কিংবা এর কূপের পানি ব্যবহার না করে— (মাযহারী)

কোন কোন হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ সামূদ জাতির উপর আপতিত আযাব থেকে আবুরেগাল নামক এক ব্যক্তি ছাড়া কেউ প্রাণে বাঁচতে পারেনি। এ ব্যক্তি তখন মক্কায় এসেছিল। মক্কার হেরেমের সম্মানার্থে আল্লাহ তাআলা তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। অবশেষে যখন সে হেরেম থেকে বাইরে যায়, তখন সামূদ জাতির আযাব তার উপরও পতিত হয় এবং সেও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রসূলুল্লাহ (আঃ) সাহাবায়ে কেরামকে মক্কার বাইরে আবুরেগালের কবরের চিহ্নও দেখান এবং বলেন ঃ তার সাথে স্বর্ণের একটি ছড়িও দাফন হয়ে গিয়েছিল। সাহাবায়ে কেরাম কবর খনন করলে ছড়িটি পাওয়া যায়। এ রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, তায়েফের অধিবাসী ছকীফ গোত্র আবু রেগালেরই বংশধর।– (মাযহারী)

এসব আযাব-বিধ্বস্ত সম্প্রদায়ের বস্তিগুলোকে আল্লাহ্ তাআলা ভবিষ্যৎ লোকদের জন্যে শিক্ষাস্থল হিসাবে সংরক্ষিত রেখেছেন। কোরআন পাক আরবদেরকে বার বার হুশিয়ার করেছে যে, তোমাদের সিরিয়া গমনের পথে এসব স্থান আজও শিক্ষার কাহিনী হয়ে বিদ্যমান রয়েছে। لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا

আযাবের ঘটনা বিবৃত করার পর বলা হয়েছে ঃ

فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ

وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ অর্থাৎ, স্বজাতির উপর আযাব নাযিল হওয়ার পর ছালেহ্ (আঃ) ও ঈমানদারগণ সে এলাকা পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তাঁর সাথে চার হাজার মুমিন ছিল। তিনি সবাইকে নিয়ে এয়ামনের 'হাযারা মাওতে' চলে গেলেন। সেখানেই তাঁর ওফাত হয়। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে তাঁর মক্কায় প্রস্থান এবং সেখানে ওফাতের কথাও জানা যায়।

আয়াতের বাহ্যিক অর্থে জানা যায় যে, ছালেহ্ (আঃ) প্রস্থানকালে জাতিকে সম্বোধন করে বললেন ঃ হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌছে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি; কিন্তু আফসোস, তোমরা কল্যাণকামীদেরকে পছন্দই কর না।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, সবাই যখন ধ্বংস হয়ে গেছে, তখন তাদেরকে সম্বোধন করে লাভ কি? উত্তর এই যে, এক লাভ তো এই যে, এ থেকে অন্যরাও শিক্ষা লাভ করতে পারবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেও বদর যুদ্ধে নিহত কোরাইশ সর্দারদেরকে এমনিভাবে সম্বোধন করে কিছু কথা বলেছিলেন। এছাড়া ছালেহ্ (আঃ)-এর এ সম্বোধন আযাব অবতরণের পূর্বেও হতে পারে— যদিও বর্ণনায় তা পরে উল্লেখ করা হয়েছে।

পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতদের কাহিনী পর্বের চতুর্থ কাহিনী হচ্ছে হযরত লূত (আঃ)-এর কাহিনী।

লূত (আঃ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। উভয়ের মাতৃভূমি ছিল পশ্চিম ইরাকে বসরার নিকটবর্তী প্রসিদ্ধ বাবেল শহর। এখানে মূর্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। স্বয়ং হযরত ইবরাহীমের পরিবারও মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। তাদের হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ্ তাআলা ইবরাহীম (আঃ)-কে পয়গম্বর করে পাঠান। কিন্তু সবাই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং ব্যাপারটি নমরূদের অগ্নি পর্যন্ত গড়ায়। স্বয়ং পিতা তাঁকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করার হুমকি দেন।

নিজ পরিবারের মধ্যে শুধু সহধর্মিনী হযরত সারা ও ভ্রাতুষ্পুত্র লূত মুসলমান হন। فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ অবশেষে তাদেরকে সাথে নিয়ে হযরত ইবরাহীম দেশ ছেড়ে সিরিয়ায় হিজরত করেন। জর্দান নদীর তীরে পৌছার পর আল্লাহ্‌র নির্দেশে হযরত ইবরাহীম (আঃ) কেনানে গিয়ে অবস্থান করেন, যা বায়তুল মোকাদ্দাসের অদূরেই অবস্থিত।

লূত (আঃ)-কেও আল্লাহ্ তাআলা নবুওয়ত দান করে জর্দান ও বায়তুল মোকাদ্দাসের মধ্যবর্তী সাদূমের অধিবাসীদের পথ প্রদর্শনের জন্যে প্রেরণ করেন। এ এলাকায় সাদূম, আমূরা, উমা, ছাবুবিম, বালে, অথবা সুগর নামক পাঁচটি বড় বড় শহর ছিল। কোরআন পাক বিভিন্ন স্থানে এদের সমষ্টিকে 'মু'তাফেকা' ও মু'তাফেকাত শব্দে বর্ণনা করেছে। এসব শহরের মধ্যে সাদূমকেই রাজধানী মনে করা হত। হযরত লূত (আঃ) এখানেই অবস্থান করতেন। এ এলাকার ভূমি ছিল উর্বর ও শস্যশ্যামল। এখানে সর্বপ্রকার শস্য ও ফলের প্রাচুর্য ছিল। (এসব ঐতিহাসিক তথ্য বাহরে মুহীত, মাযহারী, ইবনে কাছীর, আল-মানার প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে)।

কোরআন পাকের ভাষায় মানুষের সাধারণ অভ্যাস হচ্ছে كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ অর্থাৎ, মানুষ যখন দেখে, সে কারও মুখাপেক্ষী নয়, তখন অবাধ্যতা শুরু করে। তাদের সামনেও আল্লাহ্ তাআলার স্বীয় নেয়ামতের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। তারা মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী ধনৈশ্বর্যের নেশায় মত্ত হয়ে বিলাস-ব্যসন, কাম প্রবৃত্তি ও লোভ-লালসার জালে এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে যে, লজ্জা-শরম ও ভাল-মন্দের স্বভাবজাত পার্থক্যও বিস্মৃত হয়ে যায়। তারা এমন প্রকৃতিবিরুদ্ধ নির্লজ্জতায় লিপ্ত হয়, যা হারাম ও গোনাহ তো বটেই, সুস্থ স্বভাবের কাছে ঘৃণ্য হওয়ার কারণে সাধারণ জন্তু –জানোয়ারও এর

নিকটবর্তী হয় না।

আল্লাহ্ তাআলা হযরত লূত (আঃ)-কে তাদের হেদায়েতের জন্যে নিযুক্ত করেন। তিনি স্বজাতিকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ অর্থাৎ, হুশিয়ার করে বললেন ঃ তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ কর, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি।

যিনা তথা ব্যাভিচার সম্পর্কে কোরআন পাক إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً আলিফ ও লাম ব্যতিরেকেই فَاحِشَةً শব্দ ব্যবহার করেছে; কিন্তু এখানে আলিফ লামসহ الْفَاحِشَةَ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাভিচার যেন একাই সমস্ত অশ্লীলতার সমাহার এবং যিনার চাইতেও কঠোর অপরাধ।

এরপর বলা হয়েছে ঃ এ নির্লজ্জ কাজ তোমাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ করেনি। আমর ইবনে দীনার বলেন ঃ এ জাতির পূর্বে পৃথিবীতে কখনও এহেন কুকর্ম দেখা যায়নি।— (মাযহারী) সাদূমবাসীদের পূর্বে কোন ঘোরতর মন্দ ব্যক্তির চিন্তাও এদিকে যায়নি। উমাইয়া খলিফা আবদুল মালেক বলেন ঃ কোরআনে লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের ঘটনা উল্লেখ না হলে আমি কল্পনাও করতে পারতাম না যে, কোন মানুষ এরূপ কাজ করতে পারে।— (ইবনে কাছীর)

এতে তাদের নির্লজ্জতার কারণে দু'দিক দিয়ে হুশিয়ার করা হয়েছে। (এক) অনেক গোনাহে মানুষ পরিবেশ অথবা পূর্ববর্তীদের অনুকরণের কারণে লিপ্ত হয়ে যায়—যদিও তা কোন শরীয়ত সম্মত ওযর নয়; কিন্তু সাধারণের দৃষ্টিতে তাকে কোন না কোন স্তরে ক্ষমাযোগ্য মনে করা যায়। কিন্তু যে গোনাহ পূর্বে কেউ করেনি এবং তা করার বিশেষ কোন কারণও নেই; তা নিঃসন্দেহে অধিক শাস্তির যোগ্য। (দুই) যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ কিংবা কুপ্রথার উদ্ভাবন ও প্রথম প্রচলন করে, তার উপর তার নিজের কাজের গোনাহ্ ও শাস্তি তো চাপেই সাথে সাথে ঐসব লোকের শাস্তিও তার গর্দানে চেপে বসে, যারা কেয়ামত পর্যন্ত তার সে কাজে প্রভাবিত হয়ে গোনাহে লিপ্ত হয়।

দ্বিতীয় আয়াতে তাদের এ নির্লজ্জতাকে আরও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে বলা হয়েছে ঃ তোমরা নারীদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষদের সাথে কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ কর। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের স্বভাবজাত কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য আল্লাহ্ তাআলা একটি হালাল ও জায়েজ পন্থা নির্ধারণ করেছেন এবং তা হচ্ছে নারীদেরকে বিয়ে করা। এ পন্থা ছেড়ে অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করা একান্ত হীনতা ও বিকৃত চিন্তারই পরিচায়ক।

এ কারণেই সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদগণ এ অপরাধকে সাধারণ ব্যভিচারের চাইতেও অধিক গুরুতর অপরাধ ও গোনাহ বলে সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন ঃ যারা একাজ করে, তাদেরকে ঐ রকম শাস্তিই দেয়া উচিত, যেমন লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়কে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষিত হয়েছে এবং মাটি উলটিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই এরূপ ব্যক্তিকে কোন উঁচু পাহাড় থেকে নীচে ফেলে দিয়ে উপর থেকে প্রস্তর বর্ষণ করা উচিত। মুসনাদে আহ্মদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজায় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বাচনিক বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরূপ ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ অর্থাৎ, একাজে জড়িত উভয় ব্যক্তিকে হত্যা কর।- (ইবনে কাছীর)

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ অর্থাৎ, তোমরা মনুষ্যত্বের সীমা অতিক্রমকারী সম্প্রদায়। প্রত্যেক কাজে সীমা অতিক্রম করাই তোমাদের আসল রোগ। যৌন কামনার ক্ষেত্রেও তোমরা আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা ডিঙ্গিয়ে স্বভাববিরুদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়েছ!

তৃতীয় আয়াতে, লূত (আঃ)-এর উপদেশের জওয়াবে তাঁর সম্প্রদায়ের উক্তি বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ তাদের দ্বারা যখন কোন যুক্তিসংগত জওয়াব দেয়া সম্ভবপর হল না, তখন জেদের বশবর্তী হয়ে পারস্পরিক বলতে লাগল ঃ এরা বড় পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বলে দাবী করে। এদের চিকিৎসা এই যে, এদেরকে বস্তি থেকে বের করে দাও।

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে সাদূম সম্প্রদায়ের বক্রতা ও বেহায়াপনার আসমানী শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, গোটা জাতিই আল্লাহ্র আযাবে পতিত হল। শুধু লূত (আঃ) ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গী আযাব থেকে বেঁচে রইলেন। কোরআনের ভাষায় فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ বলা হয়েছে। অথাৎ, আমি লূত ও তাঁর পরিবারকে আযাব থেকে বাঁচিয়ে রেখেছি। 'আহ্ল' তথা পরিবারকে বলা হয়, এ সম্পর্কে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ তাঁর পরিবারের মধ্যে দু'টি কন্যা মুসলমান হয়েছিল; কিন্তু তাঁর সহধর্মিনী মুসলমান হয়নি। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ – অর্থাৎ, সমগ্র বস্তির মধ্যে একটি ঘর ছাড়া কোন মুসলমান ছিল না। এতে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, লূত (আঃ)-এর ঘরের লোকই শুধু মুসলমান ছিল। সুতরাং তারাই আযাব থেকে মুক্তি পেল। অবশ্য তাদের মধ্যে তাঁর বিবি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ আহ্লের অর্থ ব্যাপক। এতে পরিবারের লোকজন এবং অন্যান্য মুসলমানকেও বোঝানো হয়েছে। সারকথা এই যে, গুণা-গুণতি কয়েকজন মুসলমান ছিল। তাদেরকে আযাব থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ্ তাআলা লূত (আঃ)-কে নির্দেশ দেন যে, বিবি ব্যতীত অন্যান্য পরিবার-পরিজন ও সম্পর্কশীল লোককে নিয়ে শেষ রাত্রে বস্তি থেকে বের হয়ে যান এবং পিছনে ফিরে দেখবেন না। কেননা, আপনি যখন বস্তি থেকে বের হয়ে যাবেন, তখনই কালবিলম্ব না করে আযাব এসে যাবে।

হযরত লূত (আঃ) এ নির্দেশ মত স্বীয় পরিবার পরিজন ও সম্পর্কশীলদেরকে নিয়ে শেষ রাত্রে সাদূম ত্যাগ করেন। তাঁর বিবি প্রসঙ্গে দু'রকম রেওয়ায়েতই বর্ণিত রয়েছে। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী সে সঙ্গে রওয়ানাই হয়নি। দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে আছে, কিছু দূর সঙ্গে চলার পর আল্লাহ্র নির্দেশের বিপরীতে পিছনে ফিরে বস্তিবাসীদের অবস্থা দেখতে চেয়েছিল। ফলে সাথে সাথে আযাব এসে তাকেও পাকড়াও করল। কোরআন পাকের বিভিন্ন জায়গায় এ ঘটনাটি সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে তৃতীয় আয়াতে শুধু বলা হয়েছে যে, আমি লূত (আঃ) ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে আযাব থেকে মুক্তি দিয়েছি। কিন্তু তাঁর সহধর্মিনী আযাবে লিপ্ত রয়ে গেছে। শেষ রাত্রে বস্তি ত্যাগ করা এবং পিছন ফিরে না দেখার নির্দেশ কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াতেও উল্লেখিত রয়েছে।